শাহ ইয়াকুব বদরপুরী

রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

শাহ ইয়াকুব

বদরপুরী

রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

PARWANA PUBLICATIONS

পরওয়ানা পাবলিকেশন্স

শাহ ইয়াকুব বদরপুরী (র.)
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

প্রকাশনায়
পরওয়ানা পাবলিকেশন্স
ফুলতলী ভবন
সোবহানীঘাট, সিলেট

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৯৮
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জানুয়ারি, ২০২০

প্রচ্ছদ
মুনতাসাফুল বালাগাত

অক্ষর বিন্যাস
মো. মাহমুদুল হাসান

মুদ্রণে
ইয়াকুবিয়া কম্পিউটার্স এন্ড প্রিন্টার্স
সোবহানীঘাট, সিলেট

মূল্য : ১৫০/- [একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র]

SHAH YAQUB BADARPURI (RH.): By Muhammod Husamuddin Chowdhury. 1st Edition: December, 1998. 2nd Edition: January, 2020. Published by Parwana Publications, Fultali Bhaban, Subhanighat, Sylhet. Price: Tk.150.00 only.

বদরপুরী (র.) এর খলীফা ও স্নেহভাজন জামাতা
আমার মুহতারাম ওয়ালিদ
আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব
মুর্শিদ কিবলাহর দস্ত মোবারকে–

হযরত বদরপুরী (র.) এর ৬১তম ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত

ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর দুআ

আল্লাহ তাআলার মর্জি বা পছন্দের উপর জীবন পরিচালনা করা সকলের দায়িত্ব। কিন্তু, এই দায়িত্ববোধ সকলের সমান থাকে না। নিজে থেকেও এই দায়িত্বের প্রতি যত্নবান বা আগ্রহ তৈরী করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। যারা এ ব্যাপারে যত্নবান এবং অন্যকে পারেন উৎসাহিত করতে অর্থাৎ যাদের সংস্পর্শে এই শিক্ষা লাভ করা যায়, তাদের আমরা বলি মুর্শিদ। আল্লাহর ইচ্ছার ওপর তারা নিজেকে সোপর্দ করে দিতে পারেন বলে তাদের জীবন-কর্ম এবং আচার-আচরণও মানুষের নিকট অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। এই আদর্শ ও সফলতার পথ লাভ করার জন্য ওলী আল্লাহগণের জীবনের নানা দিক ও ঘটনাবলি জানা প্রয়োজন, প্রয়োজন জীবনী গ্রন্থেরও।

আমাদের মুর্শিদ হযরত বদরপুরী (র.), যার নির্দেশনা ও স্নেহ পরশে শুধু আমি ধন্য হইনি; বরং গোটা সমাজ ও দেশের অসংখ্য মানুষ তাঁর সান্নিধ্যে তরীকতের বন্ধনে এসে লাভ করেছিলেন আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও হুযুর (সা.) এর প্রতি মহব্বত হাসিলের পথ। পরিপূর্ণ ইলম, আমল, আখলাকসহ যাবতীয় গুণাবলিতে তিনি ছিলেন বিভূষিত। দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ মুরীদান তার নিকট থেকে তরীকতের ফয়েয লাভের পাশাপাশি হাসিল করেছিলেন, দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্যময় সামগ্রিক দিক নির্দেশনা।

তরীকতের খিদমতের পাশাপাশি তিনি ছিলেন বিশাল কর্মময় সফল এক জীবনের অধিকারী। তিনি ছিলেন একাধারে আলিমে দ্বীন, ওলীয়ে কামিল, আশিকে রাসূল, মুর্শিদে যামান, দাতা, সমাজসেবী, সমাজ সংস্কারক ও দুস্থ-অসহায় মানুষের পরম বন্ধু। একজন আদর্শ পিতা, সচেতন সংসারী, দেশ প্রেমিক ও শিক্ষাবিদ ইত্যাদি সকল গুণেও তিনি ছিলেন শীর্ষে।

হযরত বদরপুরী (র.) এর লৌকিক, অলৌকিক সুদীর্ঘ জীবন কর্ম নিয়ে গবেষণা বা লেখালেখি দ্বারা তাঁর পরিচয় তুলে ধরা সহজসাধ্য নয়। তবুও প্রয়োজন তার সম্পর্কে জানা, প্রয়োজন তার জীবনী গ্রন্থেরও।

এই সুকঠিন দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আমার ছোট ছেলে হুছাম' বদরপুরী (র.) এর রূহানী ফয়েয হাসিল করবে, এতে আমি খুবই আনন্দিত। দুআ করি, তার হাতে আল্লাহ বরকত দান করুন। এসকল কর্মের দ্বারা দ্বীনের পক্ষে একজন কলম সৈনিক হিসেবে আল্লাহ যেন তাকে কবূল করেন।

বইখানার পাণ্ডুলিপি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি শুনেছি। সংক্ষিপ্ত হলেও এতে তথ্যবহুল ও নির্ভরযোগ্য ঘটনাবলিই স্থান পেয়েছে বলে আমি মনে করি। এরপরও অনেক বিষয়ে অপূর্ণতা থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে, পরবর্তীতে তা সংযোজন করা যেতে পারে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল খিদমতকে কবূল করে দীর্ঘস্থায়ীত্ব দান করুন। আমীন।

ফুলতলী, সিলেট
২০/১২/৯৮ ইং

মোহাম্মদ আবদুল লতিফ চৌধুরী
ফুলতলী

লেখকের নিবেদন

ফুল দৃষ্টিনন্দন, দেখতে ভালো লাগে। দৃষ্টি নরম হয়ে আসে, স্নিগ্ধতায় ভরে যায় চোখজোড়া। তার সৌরভে আবিলতা দূর হয়, বিশুদ্ধ হয় বায়ু। সুবাসিত নিঃশ্বাসে মন কোমল হয়, হয়ে উঠে প্রফুল্ল। ফুলবাগিচা চারপাশের দৃশ্যপট বদলে দেয়, রঙিন করে, আমোদিত করে বায়ুপ্রবাহ, আনন্দময় হয়ে উঠে চরাচর, স্নিগ্ধতা ও পবিত্রতার পরশ বুলায়। আর তরীকতের বাগিচাতো পবিত্রতার সেতু বেয়ে আমাদের পৌঁছে দেয় আধ্যাত্মিকতার দিগন্তে। যেখানে নিজেকে ভুলে যাওয়ায়, বিলীন করে দেওয়ায়, অন্য কথায় পরিপূর্ণ সমর্পণেই অনাবিল আনন্দ, চির প্রশান্তি। কেননা, আধ্যাত্মিকতার এই দিগন্ত সেই মিলনক্ষেত্র যেখানে মানুষ লাভ করে আল্লাহ ও তাঁর হাবীব (সা.) এর সান্নিধ্য-পরশ। আর এই সান্নিধ্য মানবের পরম পাওয়া এবং তাতেই নিহিত জীবনের চরম স্বার্থকতা। এই স্বার্থকতার যে প্রবেশ পথ তরীকতের বাগিচা, যারা তার আবাদ করেন, পরিচর্যা করেন, ফুলে ফুলে বিকশিত করেন, আমরা তাঁদেরই বলি মুর্শিদ। আমাদের সেই মহান মুর্শিদ যামানার মুজাদ্দিদ হযরত আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ দ্বীনের এক আলোকময় পুরুষ। তাঁর সংস্পর্শে আলোকিত হয়ে বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মুরীদান সুশোভিত করে রেখেছেন তরীকতের বাগিচা। তরীকতের তা'লীম ছাড়াও কুরআন শরীফের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষা, মাদরাসা-মক্তব-মসজিদ প্রতিষ্ঠা, এতিমখানা-লঙ্গরখানা স্থাপন তথা দুস্থ মানুষের সেবা প্রদান, ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্য চর্চা ও তাহজীব-তামাদ্দুন বিকাশে সাংগঠনিক তৎপরতায় উৎসাহিত করা, পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকাদি প্রকাশের জন্য প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ও বাস্তবোচিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ দুনিয়া জুড়ে এক সফল বিপ্লব কায়িম করেছেন। আর এসব কর্মকাণ্ড যেখানেই পরিচালিত হচ্ছে সেখানেই তাঁর মুর্শিদ হযরত বদরপুরী (র.) এর প্রসঙ্গ এসে পড়ে, স্পষ্ট অনুভূত হয় তাঁর রূহানী অস্তিত্ব।

পীরানে পীর, কুতবুল আউলিয়া হযরত মাওলানা আবূ ইউসুফ শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী (র.) জৌনপুরী সিলসিলার অন্যতম বুযুর্গ। আমাদের মুর্শিদ ও ওয়ালিদ মুহতারাম হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহসহ অসংখ্য উলামা, পীর-মাশায়িখ তাঁর কাছে বায়আত হয়ে খিলাফত লাভ করেন। তারা আজও দুনিয়া জুড়ে হিদায়াতের আলো বিশেষভাবে তরীকতের খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। তরীকতের এই সূত্র ধরে বিশেষ করে আমাদের মুর্শিদ আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর মাধ্যমেই বদরপুরী (র.) এর সাথে আমাদের পরিচয়। এ শুধু নিছক পরিচয় নয়, এ হলো তরীকতের গভীর বন্ধন। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) নিজেও সবসময় বলে থাকেন তাঁর মুর্শিদের কথা, মুর্শিদের জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, নানা তাৎপর্যময় বিষয় এবং তরীকতের আঞ্জাম ও মানবতার সেবায় তার মহৎ অবদানের কথাও। অর্থাৎ তাঁর কর্ম-আচরণের মধ্য দিয়ে যেমন বদরপুরী (র.) এর রূহানী অস্তিত্ব আভাসিত হয়ে উঠে; তেমনি, তার বয়ানে-ভাষণে বদরপুরী (র.) এর মহৎ জীবনের নানা দিক প্রকাশিত হয়।

এতে করে ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর মহান মুর্শিদ সম্পর্কে সাধারণের মনে জানার স্পৃহা বৃদ্ধি পেয়েছে দিনে দিনে। তাঁর ইন্তিকালের পর প্রায় চল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। আজ যারা যৌবনের শেষ প্রান্তে তারাও অনেকে তাঁর জীবন সম্পর্কে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু কথা শুনেছেন মাত্র। এতে কারও মন তৃপ্ত হয়নি, হতে পারে না। কেননা বদরপুরী (র.) এর সুবিশাল সফল, আধ্যাত্মিক ও কর্মময় জীবন তরীকতপন্থীতো বটেই, যে কোনো সাধারণ মানুষের জন্যও অনুপ্রেরণা ও অনুকরণের নির্ভরযোগ্য বিষয়। ফলে এই মহাজীবন সম্পর্কে কৌতুহল এবং জানার আগ্রহ বরাবরই লক্ষ্য করা গেছে। তরীকতের বন্ধনে যুক্ত সম্মানিত ভাইদের কাছ থেকে বদরপুরী (র.) এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তথ্য নির্ভর কিছু লেখার তাগিদ পেয়ে আসছি দীর্ঘদিন থেকে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয়, ১৯৮৮ সালে জনৈক মাস্টার সাহেব বদরপুরী ছাহেব কিবলাহর জীবনী বিষয়ক একটি বই লিখে প্রকাশ করেছিলেন।

তাও আজ আর বাজারে পাওয়া সম্ভব নয়। তদুপরি, অতি তাৎপর্যময় ও গুরুত্বপূর্ণ সুবিশাল একটি জীবন সম্পর্কে পাঠক তথ্য নির্ভর ও সুবিন্যস্ত জীবনী গ্রন্থই আশা করে থাকেন। যে জীবন মানুষের অনুপ্রেরণা ও অনুসরণের যোগ্য সেই জীবনের ভাষাচিত্রকে যেমন প্রাঞ্জল হতে হয়, তেমনি হতে হয় যুক্তিগ্রাহ্যও।

কাজেই, বদরপুরী (র.) এর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হতে থাকে। এই অভাব নিরসনের উদ্যোগ আমার জন্য রীতিমতো দুঃসাহস, এই চিন্তা করে এতদিন অগ্রসর হতে সাহস পাচ্ছিলাম না। অবশেষে ওয়ালিদ মুহতারাম হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর নির্দেশ পাওয়ায় মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করলাম। হযরত বদরপুরী (র.) এর প্রিয় খলীফা ও জামাতা এবং অন্য কথায় মানসপুত্র হিসেবে গণ্য ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর কাছ থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করে লিখতে শুরু করি। প্রতিনিয়ত ব্যস্ততার মধ্যেও ছাহেব কিবলাহ তার মুর্শিদের জীবনী গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আগ্রহ ভরে শুনেছেন।

এই জীবনী গ্রন্থ রচনার কাজে আমাকে কয়েকবার ভারতের বদরপুর যেতে হয়েছে। সেখানেও যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছি। বিশেষ করে, গদ্দীনশীন বড় ছাহেবজাদা হযরত মাওলানা মাহমুদুর রহমান ছাহেব ও তৃতীয় ছাহেবজাদা জনাব মাওলানা মখলিছুর রহমান ছাহেব বিভিন্ন তথ্য দিয়ে আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। এছাড়া, স্থানীয় অনেক প্রবীণের নিকট থেকেও সহযোগিতা পেয়েছি। বদরপুরী (র.) এর বেশ কিছু কারামতের ঘটনা বিয়ানীবাজারের আলহাজ্ব ক্বারী গিয়াস উদ্দিন সাহেব, কোনাগ্রামী তার সংগ্রহ থেকে জানিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

এই বই রচনা করতে গিয়ে প্রাথমিকভাবে যেসব তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে, তা যথেষ্ট যাচাই-বাছাইয়ের পর ব্যবহারের চেষ্টা আগাগোড়াই করা হয়েছে। ফলে কিছু কিছু সংগৃহীত তথ্যও বর্জন করতে হয়েছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তথ্য কম থাকায় বিস্তারিত করা যায়নি। এছাড়া বদরপুরী (র.) এর ইন্তিকালের পর প্রায় চার দশক সময় পার হয়ে যাওয়ায় অনেক তথ্যই উদ্ধার করা সহজসাধ্য নয়। বিশেষ করে, কোনো কোনো ঘটনার সন-তারিখ যথাযথভাবে উল্লেখের সমস্যা কাটিয়ে ওঠা যায়নি। তাই কিছু কিছু বিষয়ে অপূর্ণতা থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

সর্বোপরি, বদরপুরী (র.) এর মতো সুবিশাল কর্মময় জীবনকে সংক্ষিপ্ত আয়তনে দুই মলাটের ভিতর ধারণ করতে না পারাই স্বাভাবিক। তবে পরবর্তী সংস্করণে আরও বিস্তারিত করার ইচ্ছা রইল। পাঠকবৃন্দের কাছে বিনীত অনুরোধ থাকবে, ছাহেব কিবলাহ সম্পর্কে নতুন কোনো তথ্য কারও জানা থাকলে তা আমাদের জানালে যথারীতি নাম উল্লেখসহ পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

এই বই রচনার কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা, এর স্তর বিন্যাসে আমাকে অনেকেই সহযোগিতা করেছেন। যার ফলে কাজটি দ্রুত এগিয়ে নেওয়া সম্ভবপর হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের খিদমত যেন কবূল করেন এবং সিলসিলার বুযুর্গানের অফুরন্ত ফয়েয আমাদের নসীব করেন। আমীন।

ফুলতলী ভবন, ঢাকা
২৫/১২/৯৮ইং

মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী
সম্পাদক, মাসিক পরওয়ানা

সূচিপত্র

ভূমিকা

ইলমে তাসাউফ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই জ্ঞান দ্বারা মানুষ নিজের এবং আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে পারে। সৃষ্টি আর স্রষ্টার পরিচয় লাভের মাধ্যমেই জানা সম্ভব হয়ে উঠে মানুষ সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর কি উদ্দেশ্য রয়েছে। অন্য কথায় জাগতিক ও পরলৌকিক বিষয়াবলি সম্পর্কে জানা এবং বাস্তবতার উর্ধ্বে আল্লাহর যে মহান শ্রেষ্টত্ব, কর্মকাণ্ড ও সুবিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার রয়েছে, ইলমে তাসাউফ সে বিষয়েরই ধারণা দিয়ে থাকে। এর ফলে মানুষের মধ্যে মানবতাবোধ জেগে উঠে। যা সততা, ন্যায়পরায়নতা, সৃষ্টির প্রতি দয়াশীলতা, নিরহংকারী, পরোপকারী, দানশীলতা, সত্যবাদিতা, আমানতদারী ইত্যাদি সৎগুণ অর্জনে সহায়তা করে।

ইলমে তাসাউফের অন্যতম শিক্ষা হলো, ধ্যান বা একাগ্রচিত্তে নিরিবিলি আল্লাহর নৈকট্য কামনা। জাগতিক সকল কাজ-কর্ম, চিন্তা-চেতনা থেকে শরীর, মন এমনকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে বা বিরত রেখে মহান আল্লাহর হুজুরে একান্তভাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে ধ্যান বা মুরাকাবার বিকল্প নেই। ওলী আল্লাহগণের সান্নিধ্যেই অর্জিত হয় এই শক্তি। কারণ, উত্তম গুণাবলি ও শিক্ষা বিজ্ঞ মানুষ থেকেই অর্জন করতে হয়। এই শক্তি আল্লাহ মানুষকে পৃথকভাবে দান করেছেন। এর দ্বারা জীবনের সংশোধনীও লাভ হয়ে থাকে। আর ধ্যান বা চিন্তাশক্তি মানুষের আকল বা বুদ্ধিদীপ্ত গুণ বলে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন। এই শক্তি ও গুণ দ্বারা নিজেকে সংশোধন করতে না পারলে অন্যকেও সংশোধন বা উত্তম কর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা যায় না।

একাগ্রচিত্তে ইবাদত-বন্দেগী বা আল্লাহর গোলামী আর সৎ চরিত্র এই দুইয়ে মিলে মানুষ সফল মুমিন হিসেবে দ্বীন ও দুনিয়াকে স্বার্থক ও সুন্দর করতে পারে। তাই ইলমে তাসাউফ চর্চা অর্থাৎ, এতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া মুসলমানদের জন্য খুবই প্রয়োজন। প্রয়োজন সূফী, পীর ওলীগণ সম্পর্কে জানা, তাঁদের স্বার্থক জীবন-কর্ম ইত্যাদি আলোচনা করা এবং নিজের মধ্যে এর অনুশীলন-অনুকরণের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

মা'রিফাতের এমনি এক জ্যোতিষ্মান পুরুষ, উপ-মহাদেশ খ্যাত জৌনপুরী সিলসিলার সমকালীন অন্যতম বুযুর্গ হযরত মাওলানা আবূ ইউসুফ শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী (র.)। তিনি শুধু কামিল ওলী ছিলেন না, ছিলেন সমসাময়িককালে খ্যাতনামা বিশিষ্ট এক আলিমে দ্বীনও। হাদীস, তাফসীর ও ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়ে প্রথম যৌবনেই পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তিনি।

জ্ঞান চর্চায় তিনি তৎকালীন উপ-মহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিমগণের প্রত্যক্ষ সাহচর্য লাভ করেছিলেন। তিলে তিলে তাঁদের সুযোগ্য শিষ্য হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন নিজেকে। আর তাই বাংলা ও আসামে তাঁর লক্ষ লক্ষ মুরীদানের কাছে তিনি একজন পীরে কামিল ও মহান মুর্শিদই কেবল ছিলেন না; বরং তারা তাঁকে পেয়েছিলো সামগ্রিক জীবনাচরণে দিক নির্দেশনায় রাহবারে হক বা সঠিক পথ প্রদর্শক হিসেবেও। অর্জিত জ্ঞান ও সদগুণাবলিকে তিনি নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অকাতরে অকৃপণভাবে সর্বসাধারণ্যে বিলিয়ে গেছেন আজীবন।

জ্ঞানে-গুণে, আমল-আখলাকে, চরিত্র-মাধুর্যে তিনি যেমন শীর্ষে ছিলেন, তেমনি দয়া-মায়া, প্রেম-ভালোবাসা, স্নেহ-মমতায়ও তিনি ছিলেন অসাধারণ। সৌম্য শান্ত উজ্জ্বল-দীপ্ত চেহারা, সুন্দর-নম্র আচরণ, মিষ্ট মধুর বাণী, গভীর জ্ঞান, প্রখর মেধা- এ সবই ছিলো তাঁর বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর প্রেমে নিবিষ্ট মন, অনুকরণীয় আমল-আখলাক তাঁর ব্যক্তিত্বকে দিয়েছিলো ঋজুতা ও মাধুর্য। অসাধারণ ব্যক্তিত্ববান এই ওলীর বহু সৎকর্মের মধ্যে অন্যতম ছিলো বিশুদ্ধ কুরআন পাঠ চর্চা। এ ব্যাপারে তাঁর আন্তরিক নিষ্ঠা ও প্রেরণা ছিলো সততঃ সক্রিয়।

আল্লাহর দয়া ও নৈকট্য, হুযুর (সা.) এর মহব্বত, বিশুদ্ধ ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস, দ্বীনি খিদমত আর মানব সেবার মতো উত্তম যত গুণাবলি সবকিছুর অনুপ্রেরণা তাঁর মাধ্যমে লাভ করেছিলো লক্ষ লক্ষ ভক্ত মুরীদান। আজও তাঁর সেই ধারাবাহিকতা সুযোগ্য উত্তরসূরীদের মাধ্যমে জারি রয়েছে দুনিয়া জুড়ে।

হযরত বদরপুরী (র.) মুরশিদে কামিল, মুজাদ্দিদে যামান হযরত আল্লামা আব্দুল লতীফ চৌধুরী ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.) এর মুর্শিদ। এই সূত্র ধরেই তাঁর সাথে আমাদের পরিচয়। আর ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর মাধ্যমে দুনিয়া জুড়ে ইসলামের যেসকল বহুমূখী খিদমত চালু হয়েছে, এতেই বদরপুরী (র.) এর রেখে যাওয়া যোগ্য উত্তরসূরী মনোনয়নে সঠিক সিদ্ধান্তের পরিচয় মিলে।

হযরত বদরপুরী ছাহেব কিবলাহ (র.) আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু কর্মের দ্বারা তিনি অমর হয়ে আছেন লক্ষ-কোটি মানুষের অন্তরে।

অধ্যায় : এক

যেভাবে প্রকাশিত হলেন

ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় শহর শিলচর। এ শহরের ব্যস্ত এক রাজপথ। পাশ দিয়ে আপন মনে হেঁটে চলেছেন এক দরবেশ। বাখর শাহ নামে সুপরিচিত দরবেশ শিলচরবাসীদের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। সবাই তাঁকে সমীহ ও মান্য করে। সেকালে সর্বজন শ্রদ্ধেয় মজ্‌জুব বাখর শাহ যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন তার পাশেই এক দোকানের সামনে চেয়ারে বসে আছেন খ্যাতনামা এক আলিম। নম্র, ভদ্র ও কিছুটা লাজুক স্বভাবের এই আলিম ব্যক্তি আচার-আচরণে ও কথায়-কাজে সবার প্রিয় এবং আদর্শ স্থানীয়। তন্ময় হয়ে কিছু একটা ভাবছেন তিনি।

পথ চলতে চলতে হঠাৎ বাখর শাহ'র দৃষ্টি পড়ল এই মাওলানা সাহেবের উপর। তাঁর চোখে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়ালেন মজ্‌জুব বাখর শাহ। একে অপরের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে স্থির হয়ে রইলেন। মুখে কোনো কথা নেই, দুজনেই নিশ্চুপ। এক সময় চোখ বন্ধ করে উভয়েই ধ্যানমগ্ন হলেন। বাখর শাহ দাঁড়ানো, মাওলানা সাহেব পূর্ববৎ বসা। এভাবে সময় বয়ে চলল। তখন ছিলো শীতকাল। অথচ, দুজনের শরীর দিয়ে অঝোরে ঝরছে ঘাম। এক এক করে শিলচর শহরে এই ব্যতিক্রমী দৃশ্যটি অনেকের চোখে পড়ল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ভিড় জমে গেলো। সবার চোখ এই অভূতপূর্ব দৃশ্যে স্থির। মজ্‌জুব বাখর শাহকে জানেন না এমন কেউ নেই শিলচরে। তারা বেশ বুঝতে পারলেন আধ্যাত্মিক কোনো এক গূঢ় ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু তারা অবাক হলেন মাওলানা সাহেবকে দেখে। তিনি সেকালের এক শ্রেষ্ঠ আলিম। এছাড়া তাঁর আর কোনো পরিচয়তো তাদের জানা নেই।

দেখতে দেখতে হঠাৎ যখন বাখর শাহ দরবেশ ছিটকে পড়ে গেলেন মাটিতে। লোকজন তখন বিস্ময়ে থ'। বাখর শাহকে নিয়ে এরকম ঘটনার মুখোমুখি শিলচরবাসী আগে কখনো হয়নি। মুহূর্তের মধ্যে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ভিড়ের মধ্য থেকে কয়েকজন ছুটে এসে তার সেবাযত্ন করতে লাগলেন। অল্পক্ষণ পর তিনি উঠে বসলেন এবং দাড়িয়ে কোনোদিকে না তাকিয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলেন। কারও পক্ষেই তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করা সম্ভব হলো না। এবার উপস্থিত সকলের দৃষ্টি স্থির হলো মাওলানা সাহেবের উপর। তিনি ধ্যান ভেঙ্গে খুব স্বাভাবিক বসেছিলেন। কিন্তু লোকজনের দৃষ্টি যখন কৌতুহলী হয়ে উঠতে

লাগলো তখন তিনি উঠে পড়ে আলগোছে স্থান ত্যাগ করলেন। উপস্থিত লোকজন তাঁর কাছ থেকেও কিছু জানার অবকাশ পেল না। কিন্তু, অভূতপূর্ব এই ঘটনার আকস্মিকতা কেটে উঠার পর সবাই বুঝতে পারল, সকলের কাছে সম্মানিত ও সুপরিচিত খ্যাতনামা আলিম হযরত মাওলানা আবূ ইউসুফ শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব শুধু নিছক একজন আলিম মাত্র নন। অথচ, এতদিন মানুষ তাঁকে শুধু একজন আলিম হিসাবেই জানতেন। আজ দিনের আলোর মতো শিলচরবাসীর কাছে প্রকাশিত হলো মাওলানা সাহেবের আধ্যাত্মিক তেজঃপ্রভা -যার শানিত উদ্ভাসের সামনে বাখর শাহ'র মতো দরবেশও ম্রিয়মান হয়ে পড়লেন। শীতের এই সকালে শিলচর শহরে যে আলোর অপূর্ব বিচ্ছুরণ ঘটল, তার সম্মোহনী আকর্ষণে দলে দলে মানুষ ছুটে গেলো হযরত শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুবের কাছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল গোটা কাছাড় ও সিলেট জেলায়। সবাই জেনে গেলেন তিনি জৌনপুরী সিলসিলার পীরে কামিল হযরত হাফিজ আহমদ জৌনপুরী (র.) এর খিলাফত ও ফয়েযপ্রাপ্ত হয়েছেন আগেই। তাঁর হৃদয়ে আধ্যাত্মিকতার যে ফুল প্রস্ফুটিত হয়েছিলো গোপনে, এবার তার সৌরভ ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে।

এভাবে অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে নিজের অজান্তে তিনি প্রকাশিত হলেন। চতুর্দিক থেকে অসংখ্য লোক তাঁর খিদমতে হাজির হতে লাগলো। তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করে বাংলা ও আসাম অঞ্চলের অগনিত মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পেলো। পরবর্তীতে বিধবা, এতিম ও গরীব-দুঃখীদের অকাতরে দান-খয়রাত ছাড়াও দ্বীনের প্রচার-প্রসারে এবং বাংলা-আসামে বহু মসজিদ, মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণে নিয়োজিত থেকে যুগের শ্রেষ্ঠ ওলী, আলিমে দ্বীন, আশিকে রাসূল, মহান মুর্শিদ অদ্বিতীয় দাতা ও মানুষের পরম বন্ধু হিসেবে তাঁর পরিচিতি ও সুখ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়ে।

জন্মস্থান

খরস্রোতা পাহাড়ী নদী বরাক পাহাড়, অরণ্য এড়িয়ে সবুজের বুক চিরে প্রবাহিত বদরপুরে। রূপালী এই নদী, দুপাশে বিস্তীর্ণ সবুজ-শ্যামল শস্য ভূমি। চারপাশ ঘিরে রয়েছে আসামের অরণ্যময় পার্বত্য অঞ্চল। চমৎকার প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত বদরপুর করিমগঞ্জ জেলার পূর্ব সীমান্তের শেষ থানা। করিমগঞ্জ ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় আসাম রাজ্যের রেল নৌ ও সড়কে যোগাযোগ কেন্দ্র হিসেবে সুদূর অতীত থেকেই সুখ্যাত। বদরপুরও কমবেশী একই

কারণে পরিচিত এবং ছিলো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণও। অবিভক্ত ভারতে সিলেট জেলার অন্তর্গত করিমগঞ্জ মহকুমার থানা বদরপুর তার অতীত খ্যাতি ও গুরুত্ব ধরে রেখেছে এখনো। ভারতের পূর্বাঞ্চলের অন্যতম রেল জংশনতো বটে, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যকার একমাত্র সংযোগ। সড়কও গেছে এই বদরপুরের উপর দিয়েই। এই জেলার যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বদরপুরের অবস্থান এ কারণেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পাহাড়-অরণ্য ঘেরা সবুজ-শ্যামল বদরপুর জনপদ গোটা অঞ্চলে প্রাচীনতম। সভ্য এলাকা হিসেবেও পরিচিত। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, মুসলমানরাই প্রথম সভ্যতার আলোয় আলোকিত করেন এই এলাকা। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই জনপদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও প্রচলিত আচার-আচরণ যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী। অসংখ্য পীর-আউলিয়ার পদধুলিতে ধন্য বদরপুর। হযরত শাহজালাল ইয়ামনী (র.) ও এই অঞ্চল সফর করেন। তাঁর পাঁচ পাঁচজন সঙ্গী ওলী এখানে স্থায়ীভাবে থেকেছেন, মানুষকে হিদায়াতের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন এবং এখানকার মাটিতেই সমাহিত আছেন। কাছাকাছি স্থানে রয়েছে তাদের মাজার। হযরত শাহজালাল (র.) এর পাঁচজন সঙ্গী অন্য কোনো অঞ্চলে এত কাছাকাছি সমাহিত রয়েছেন বলে জানা যায় না। এতে এই জনপদের আধ্যাত্মিক গুরুত্বও আভাসিত হয়ে আছে। এই পাঁচজন ওলী হলেন, হযরত শাহ আদম খাকী (র.), শাহ বদর উদ্দিন (র.), শাহ জিয়া উদ্দিন (র.), শাহ সিকান্দর (র.), শাহ আবদুল মালিক (র.)। অনেক বিখ্যাত মজ্‌জুব-দরবেশও এই অঞ্চলকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁদের নির্বিঘ্ন আস্তানা হিসেবে।

বরদপুরের নামকরণ হয়েছে হযরত শাহজালাল (র.) এর অন্যতম সঙ্গী হযরত শাহ বদর উদ্দিন (র.) এর নামানুসারে। বরাক তীরে সেদিনের ছোট বদরপুর ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হয়েছে এবং এই অঞ্চলকে থানায় রূপান্তরের সময় থানার নামও হয় বদরপুর। ব্রিটিশ আমলে আসাম-বেঙ্গল রেলপথের কুলাউড়া-শিলচর লাইনও স্থাপিত হয় বদরপুরের উপর দিয়ে।

মাতৃগর্ভে যখন

হযরত বদরপুরী (র.) এর জন্মের আগেই তাঁর পূণ্যময়ী মাতা অবহিত হয়েছিলেন তার গর্ভের সন্তান সম্পর্কে। এক রাতে তিনি স্বপ্নযোগে অবগত হন তার গর্ভের সন্তানের ভবিষ্যত। স্বপ্নে একজন এসে তাকে জানান, তার গর্ভে রয়েছেন এক পুত্র সন্তান। তিনি বড় হয়ে খ্যাতনামা আলিম হবেন। শুধু তাই নয়, তিনি হবেন ওলী আল্লাহও। আপনি এই পুত্র সন্তানের নাম রাখবেন মুহাম্মদ ইয়াকুব। বলার অপেক্ষা রাখে না, স্বপ্নে প্রাপ্ত এই নির্দেশ মতেই শিশু

বদরপুরী (র.) এর নাম রাখা হয় আবূ ইউসুফ মুহাম্মদ ইয়াকুব। আর স্বপ্নে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিলো তাও কালক্রমে অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়। সন্তানের ভবিষ্যত সম্পর্কে পূণ্যময়ী মায়ের স্বপ্ন যে বিফলে যায় না তাই প্রমাণিত হলো।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

বদরপুর শুধু আধ্যাত্মিক গুরুত্বপূর্ণ এক জনপদ নয়; এর ঐতিহাসিক গুরুত্বও বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। মোগল আমলে সাম্রাজ্যের এই পূর্বপ্রান্তে স্থাপিত হয় চারটি তোপখানা। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে দিল্লী থেকে পাঠানো হয় চারজন সামরিক কর্মকর্তা। তাদের একজন মীর বা সৈয়দ বংশীয়, একজন পাঠান বংশীয়, একজন শেখ বংশীয় এবং অন্যজন ছিলেন বেগ বা মোগল বংশীয়। গোটা মোগল আমল ধরে এই চারটি তোপখানা বহাল ছিলো। তোপখানা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত এই চার সামরিক কর্মকর্তার দীর্ঘ অবস্থানের দরুন এই অঞ্চলে তাদের বংশধরদের স্থায়ী বসতি গড়ে উঠে। মোগল সম্রাটের শেখ বংশীয় সামরিক কর্মকর্তার বংশধারা বদরপুর বাজারের পার্শ্ববর্তী বর্তমান বুন্দাশীল গ্রামে বসবাস শুরু করেন। বরাক নদীর তীর ঘেঁষে অবস্থিত এই গ্রাম। 'বন্দে-আছিল' বা প্রধান ঘাঁটি বা ক্যাম্প থেকে বুন্দাশীল নামকরণ হয়েছে বলে জানা যায়।

এই বুন্দাশীলে শেখ বংশীয় যারা বসতি স্থাপন করেছিলেন তাদের বংশ পরম্পরা উপর দিকে প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। সহজেই অনুমিত হয়, এই শেখ বংশীয়রা ভারতে এসে প্রথম দিল্লীতে বসবাস শুরু করেন। মোগল আমলে তাঁরা বদরপুরের বুন্দশীলের বাসিন্দা হন। হযরত মাওলানা আবূ ইউসুফ শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী (র.) এই শেখ বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। সেটা ছিলো বাংলা ১২৬৪ সন এবং খ্রিষ্টীয় ১৮৫৭ সাল। তাঁর পিতা শাহ মুহাম্মদ বাছির ছিলেন অত্যন্ত দ্বীনদার লোক। সৎ স্বভাব ও ধর্মপরায়ণতার জন্য গোটা এলাকায় তাঁর সুনাম ও কদর ছিলো। হযরত বদরপুরী (র.) এর আম্মাও ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ পূন্যময়ী এক জননী।

বদরপুরের বুন্দশীলে বসবাসকারী শেখ বংশীয়গণের প্রথম পুরুষ ছিলেন শেখ মুহাম্মদ সাদিক। তিনি ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর পূর্ব পুরুষদের অন্যতম। তাঁর থেকে হযরত বদরপুরী (র.) পর্যন্ত বংশ তালিকা নিম্নরূপঃ

[প্রথম পুরুষ]
শেখ মুহাম্মদ সাদিক
|
শেখ মুহাম্মদ লতিফ
|
মুহাম্মদ ইউনুছ | মুহাম্মদ বিনা | মুহাম্মদ রওশন
|
মুহাম্মদ বাছির
|
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব

শিশুকাল

মানব ইতিহাসে দেখা গেছে, জগতে যারা মহান আল্লাহর বিশেষ রহমত লাভ করেন এবং তাঁর খিদমত আঞ্জাম দেওয়ার কাজে নিয়োজিত হন তাঁদের অনেককেই জীবনে নানা দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, বেশি করে পেতে হয় হারানোর ব্যথা-বেদনা এবং প্রতিনিয়ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। সম্ভবতঃ এভাবেই তাঁদেরকে ধৈর্য, সহ্য, স্থিরতা, ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা ইত্যাদি সকল সৎগুণের অনুশীলনের মাধ্যমে ভবিষ্যত কর্মের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়।

হযরত বদরপুরী (র.) এর ক্ষেত্রেও এর বিশেষ ব্যতিক্রম হয়নি। নিতান্ত শিশু বয়সেই তাঁকে সইতে হয় অতি আপনজন হারানোর বেদনা। স্নেহশীল পিতা ও মাতা উভয়কে হারিয়ে তিনি নিতান্ত শিশুকালেই এতিম হন। পিতা-মাতার আদর, সোহাগ, স্নেহ-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হওয়ার যে বেদনা তা অনুভব করেন অতি অল্প বয়সেই। নিজের ব্যথা-বেদনা এবং সেই সাথে দুটি বোনের ব্যথা-বেদনার ভারও তাঁকে বইতে হয়। তবে এতিমগণ যেহেতু আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত থাকে না, সেহেতু হযরত বদরপুরী (র.) ও এতিম জীবনের অসহায়ত্ব থেকে মুক্ত হন। এতিম ভাগ্নে ও দুই ভাগ্নীর প্রতি আশ্রয়ের হাত বাড়িয়ে দেন মামা জিতু মিয়া খান। তিনি এই এতিমদের নিজের বাড়িতে নিয়ে লালন-পালন করেন।

বাল্যকাল

বালক ইয়াকুব ছিলেন প্রায় সব দিক দিয়েই ব্যতিক্রম স্বভাবের। অসাধারণ পরিণতবোধ, সংযম, ন্যায়-নিষ্ঠা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিলো তাঁর মধ্যে সেই বয়সে, যখন ছেলেমেয়েরা পিতা-মাতার আদর, সোহাগের ছায়ায় থেকে

হেসে-খেলে সময় কাটায়। তিনি হাসি-ঠাট্টায় যোগ দিতেন না। কখনোই অযথা সময় নষ্ঠ করতেন না। খেলাধুলাতেও বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। বিশেষভাবে উল্লেখ করবার বিষয় হলো, সমবয়সী বালকদের কাছে তাঁর অবস্থান একই সমতলে থাকেনি। যেকোনো ব্যাপারে বালকরা তাঁকে বিশিষ্ট হিসেবে গণ্য করতো। ছেলেদের খেলাধুলার সময় যে মনোমালিন্য ও ঝগড়া-বিবাদ হয়, তেমন হলে তাঁর সমবয়সীরা তাঁকেই সালিশ মানতো। তাঁর ওপর বিচারের ভার দিতো। আর তিনি যে ঘটনার যে ফয়সালা বা সমাধান দিতেন তাই সকলে মেনে নিত একবাক্যে। এভাবেই তিনি সমবয়সীদের আস্থা, ভরসা, সমীহ অর্জন করে বিশিষ্ট হয়ে উঠেন। সবার থেকে যে তিনি আলাদা, এটা ক্রমাগত স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে। কথা-বার্তা, চাল-চলন অর্থাৎ, আচার-ব্যবহারতো বটেই এবং এমনকি, নামায-রোযার মতো শরয়ী বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রেও সমবয়সী বালকদের থেকে তাঁর পার্থক্য যথেষ্ট ছিলো স্পষ্ট। বালক ইয়াকুবের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এই বিশিষ্টতা অতি সহজেই সকলের নজর কাড়তো। স্বল্পভাষী এই বালক লেখাপড়া, নামায-বন্দেগীতেও যেমন নিষ্ঠাবান ছিলেন, তেমনি মুরব্বীদের প্রতি আদব প্রদর্শন, তাদের সেবাযত্ন ইত্যাদিতে সকলকে অভিভূত ও মুগ্ধ করেন। পিতা-মাতাহীন এই বালকটির চেহারা-সূরাত দেখে, তাঁর আদব-লেহায দেখে সবাই চমৎকৃত হতেন। ভালোবাসতেন এই বালককে। লৌকিকতার বাইরে এমন একটা কিছু ছিলো তাঁর মধ্যে যা অনুভব করে আকৃষ্ট না হয়ে পারতেন না মুরব্বীজনেরা।

অধ্যায় : দুই

প্রাথমিক শিক্ষা

হযরত বদরপুরী (র.) এর মধ্যে শিশুকালেই লেখাপড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। মামার তত্ত্বাবধানে থাকাকালীন তাঁর আল কুরআন পাঠের হাতে খড়ি হয়। তারপর তাঁকে ভর্তি করা হয় বাগবাড়ি মাদরাসায়। প্রকৃতপক্ষে, এখানেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। বদরপুর থেকে অল্প দূরে এই বাগবাড়ি মাদরাসা। এখানে মাওলানা নজিব আলী চৌধুরী সাহেব ছিলেন হৃদয়বান দূরদর্শী। তিনি বালক ইয়াকুবের মধ্যে প্রতিভার স্পষ্ট স্বাক্ষর দেখতে পেয়েছিলেন। নিজে থেকে তিনি তার অভিভাকত্ব গ্রহণ করেন। চৌধুরী সাহেবের অভিভাবকত্ব সব সময় ঘিরে রাখে এই উৎসাহী, উদ্যমী ও অধ্যবসায়ী ছাত্রকে। এছাড়া, মাদরাসার শিক্ষকদের স্নেহ ছায়াও তিনি সমভাবে লাভ করেন। মেধাবী, নিষ্ঠাবান ও ব্যতিক্রমী চরিত্র-বৈশিষ্টের অধিকারী বলে বাগবাড়ি মাদরাসার ছাত্রদের মধ্যেও তার বিশিষ্টতা লক্ষ্যনীয় হয়ে উঠে। যথাসময়েই তিনি এই মাদরাসা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য হযরত বদরপুরী (র.) কে যেতে হয় সিলেটের গোলাপগঞ্জ থানায়। এখানকার ফুলবাড়ি মাদরাসা ছিলো তখন সুপ্রসিদ্ধ। কিশোর ইয়াকুব এসে ভর্তি হলেন এ মাদরাসায়। প্রখর মেধা, চারিত্রিক মাধুর্য এবং ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্নতা অচিরেই তাঁকে মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক মহলে সুপরিচিত করে তোলে। সেই সাথে তিনি লাভ করেন সকলের স্নেহ-ভালোবাসা। বিশেষ করে, মাদরাসার শিক্ষকগণের স্নেহের পাত্র হয়ে উঠেন। পড়ালেখার প্রতি তাঁর একাগ্রতা ও নিষ্ঠা যেমন ছিলো, তেমনি, ইবাদত-বন্দেগীতেও নিবিড়ভাবে তিনি মশগুল থাকতেন। এই বয়সে সাধারণতঃ এতটা নিমগ্নতা সাধারণ্যে লক্ষ্য করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে শিশু ও বাল্যকালে তার মধ্যে যে ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ঠাবলি ধরা পড়ে তা কৈশোর-যৌবনের বয়ঃসন্ধিকালে আরও স্পষ্ট ও গভীর হয়ে উঠে। বলা যায়, ফুলবাড়ি মাদরাসায় তিনি দশজন ছাত্রের মধ্যে একজন ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একাদশ জন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন সবার থেকে আলাদা, অনন্য। গোলাপ যেভাবে একটি একটি করে পাঁপড়ি মেলে ফুটতে থাকে, কৈশোর তারুণ্যের

মাঝামাঝি অবস্থায় তিনিও এইভাবে ক্রমান্বয়ে ফুটে উঠেছিলেন, বিকশিত হয়েছিলেন। তাঁর এই ফুটনোন্মুখ গোলাপ সদৃশ্য বৈশিষ্ট্য এ সময় কোনো কোনো আলিম-বুযুর্গের দৃষ্টিতেও ধরা পড়ে। তাঁর ভবিষ্যত কর্মময় জীবনের সাফল্যের ইঙ্গিতও করতেন তারা। বলা যায়, ফুলবাড়ি মাদরাসাতে ছাত্রাবস্থায়ই হযরত বদরপুরী (র.) এর ভবিষ্যত প্রচ্ছন্নভাবে ফুটে উঠেছিলো।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা

ফুলবাড়ি মাদরাসা থেকে সাফল্যের সাথে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করলেন। এবার উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের পালা। শিক্ষার প্রতি-জ্ঞানার্জনের প্রতি হযরত বদরপুরী (র.) এর মধ্যে যে নিবিষ্টচিত্ততা ক্রমান্বয়ে গড়ে উঠেছিলো, তা-ই হয়তো তাঁকে সুদূরের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। অপরিচিত পরিবেশে যত গভীরভাবে জ্ঞানার্জনে মনোযোগী হওয়া যায় এবং একই সাথে যত নিবিড়ভাবে নিজেকে অনুভব করা যায় তা পরিচিত পরিবেশে অনেক সময়ই হয় বাধাগ্রস্ত। আর এতো বলার অপেক্ষা রাখে না, নিজেকে নিবিড় অনুভূতির মধ্যে চেনার একেকটি সোপান অতিক্রমের মধ্য দিয়েই মানুষের অন্তর্দৃষ্টিতে মহান আল্লাহর শানের পরিচয় ক্রমান্বয়ে উদ্ভাসিত হতে থাকে। এই চেতনা সদ্য তরুন মুহাম্মদ ইয়াকুবের মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠবে, তাঁর শৈশব-কৈশোরের চরিত্র বৈশিষ্টের নিরিখে এটাই স্বাভাবিক। এই চেতনা তাঁর হৃদয়ে যে প্রেরণা সৃষ্টি করে তার তাগিদেই তিনি সুদূর উড়িষ্যার কটকে গমন করেন। এখানে ভর্তি হন কটক আলিয়া মাদরাসায়। এখানকার অপরিচিত পরিবেশ তাঁকে মোটেই স্বাচ্ছন্দহীন পরিস্থিতিতে ফেলেনি। কেননা, বিনয়-নম্র আচার-আচরণ ও পরিচ্ছন্ন সুন্দর চরিত্র বৈশিষ্টের অধিকারী হওয়ার দরুন তিনি সহজেই কটক আলিয়া মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক সকলের ভালোবাসা ও স্নেহ লাভে সক্ষম হন। তদুপরি তিনি আগাগোড়াই ছিলেন অধ্যয়ন প্রিয় ও মেধাবী ছাত্র। বলার অপেক্ষা রাখে না, উনিশ শতকের শেষার্ধে কলকাতা বা ভারতবর্ষের অন্যান্য ব্রিটিশ প্রশাসনিক কেন্দ্র সমৃদ্ধ শহরের তুলনায় উড়িষ্যার কটক ছিলো অনেকাংশেই নিরিবিলি। এখানকার আলিয়া মাদরাসার শিক্ষার পরিবেশও ছিলো অপেক্ষাকৃত শান্ত। এই নিরিবিলি পরিবেশে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে মাদরাসার উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন হযরত বদরপুরী (র.)।

উচ্চ শিক্ষা

সেকালে ভারতের উত্তর প্রদেশে রামপুর ছিলো ইসলামী শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা কেন্দ্রিক রামপুর আলিয়া মাদরাসার সুনাম তখন কারও অজানা ছিলো না। কটক থেকে অল্প সময়ের জন্য বাড়িতে ফিরে আবার তৈরি হলেন শিক্ষা সফরের উদ্দেশ্যে।

হযরত বদরপুরী (র.) এর এবারকার গন্তব্য এই রামপুর। এখানে তিনি ভর্তি হলেন রামপুর আলিয়া মাদরাসায়। হাদীস, তাফসীর ও অন্যান্য বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের অত্যন্ত চমৎকার পরিবেশ ছিলো এখানে। সে আমলে সারা ভারতে খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণের অনেকেই জ্ঞান বিতরণে নিয়োজিত ছিলেন রামপুর আলিয়া মাদরাসায়। তাদের সোহবতে-সাহচর্যেই শুরু হয় হযরত বদরপুরী (র.) এর উচ্চতর শিক্ষা। উল্লেখ্য, অধ্যক্ষ আল্লামা ফজলে হক রামপুরী (র.), মাওলানা আবদুল হক খয়রাবাদী (র.), আল্লামা ইরশাদ হুসেন (র.), মুহাদ্দিস আল্লামা মনোহর আলী (র.) প্রমুখ ছিলেন তাঁর উস্তাদগণের অন্যতম। পরে আল্লামা মনোহর আলী ছাহেবকে শেষ বয়সে ব্রিটিশ সরকার রামপুর থেকে কলিকাতা আলিয়ার মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করতে বাধ্য করেছিলো। মেধাবী ছাত্র হিসেবে এবং চমৎকার আমল-আখলাকের জন্য বদরপুরী ছাহেব মনীষীতুল্য শিক্ষকগণের অফুরন্ত স্নেহ লাভ করেন। এমনকি রামপুর আলিয়ার অধ্যক্ষ আল্লামা ফজলে হক ছাহেব ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও বদরপুরী ছাহেবের প্রতি যে আচরণ বা সম্মান দেখাতেন, তাতে বদরপুরী ছাহেব যে তার ছাত্র তা বুঝাই যেতো না। অল্প দিনেই তার সুনাম ও যশ ছড়িয়ে পড়ে রামপুর আলিয়া মাদরাসার চৌহদ্দি ছাড়িয়ে। বাগানে ফুল ফুটলে যেমন চতুর্দিকে তার খুশবু ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি রামপুর আলিয়া মাদরাসার বাগে প্রস্ফুটিত মুহাম্মদ ইয়াকুব নামের গোলাপের খুশবু ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। রামপুরের খোদ নওয়াব সাহেবের কাছেও পৌছে গেলো এই গোলাপের সুবাস। মুহাম্মদ ইয়াকুব লাভ করেন নওয়াব আলী আব্বাসের অভিভাবকত্ব। নিঃসন্দেহে একজন মাদরাসা ছাত্রের জন্য এ ছিলো রাজকীয় স্বীকৃতির বিষয়। তবে, বদরপুরী ছাহেবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিলো এমনই যে, দুনিয়াবী কোনো স্বীকৃতি বা সৌভাগ্যই আত্মবিস্মৃত করতে পারেনি তাকে। অথচ, তিনি ইচ্ছা করলেই রামপুরে থেকে যেতে পারতেন, পারতেন রামপুরের নওয়াবের কোনো বৃত্তি লাভ করতে কিংবা জাগতিক দৃষ্টিকোন থেকে কোনো লোভনীয় কর্মে নিয়োজিত হতে। শিক্ষা জীবনে সহজলভ্যতার

পথে তিনি ধাবিত হননি কখনো। ছাত্র জীবন সমাপ্ত করার পর সেই প্রথম যৌবনেও তিনি এই চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় রেখেছেন। নির্দিষ্ট লক্ষ্যমূলে জীবনকে চালিত করার।

শিক্ষকতা

হযরত বদরপুরী (র.) এর কর্মজীবন শুরু হয় শিক্ষকতা দিয়ে। রামপুর আলিয়া মাদরাসা থেকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি ফিরে আসেন জন্মস্থান বদরপুরে। রামপুরে ছাত্র থাকা অবস্থাতেই তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে জন্মভূমিতেও। বদরপুর থেকে সামান্য দূরে কাঠিগড়া মাদরাসা। মাদরাসা কর্তৃপক্ষের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি শিক্ষকতায় যোগদান করেন। এই তার প্রথম কর্মজীবনের শুরু। বয়সে তরুণ হলেও শিক্ষকতায় তিনি যথেষ্ট পারদর্শীতার পরিচয় রাখেন। তার দ্বিতীয় কর্মক্ষেত্র ছিলো জয়নগর মাদরাসা। এখানেও তিনি বেশ কিছুকাল শিক্ষকতায় নিয়োজিত থাকেন।

পরবর্তীতে হযরত বদরপুরী (র.) নিজে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। আর তা করেন নিজ বাড়ির নিকটবর্তী স্থানে। বদরপুরের এই মাদরাসার নাম দেওরাইল সিনিয়র মাদরাসা। আজও এই মাদরাসা বদরপুরী ছাহেব কিবলাহর স্মৃতি বহন করে চলেছে। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি এই মাদরাসায় শিক্ষা দান করেছেন। বলা যায়, তার মেধা, শ্রম ও স্বপ্নে গড়া এই দেওরাইল সিনিয়র মাদরাসা। সেকালের বহু বিখ্যাত আলিম এই মাদরাসা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। হযরত বদরপুরী (র.) এর অগাধ পাণ্ডিত্বের পরশে ধন্য হয়েছেন তারা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, ছাহেব কিবলাহ ফুলতলীও এই মাদরাসায় শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ছিলেন বদরপুরী (র.) এর প্রিয় ও অতি স্নেহভাজন ছাত্র।

দেওরাইল সিনিয়র মাদরাসার পাশে রয়েছে একটি মক্তব এবং একটি এম.ই স্কুল। এছাড়া এখানে রয়েছে একটি ঈদগাহও। হযরত বদরপুরী (র.) এই ঈদগাহ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তিনিই ঈদের জামাতে ইমামতি করতেন। দেওরাইল মাদরাসার মতো এসব প্রতিষ্ঠানেও বদরপুরী ছাহেব কিবলাহর স্মৃতি বিজড়িত রয়েছে। মসজিদ, মাদরাসা ও মক্তব প্রতিষ্ঠায় তার প্রেরণা এবং উৎসাহও সুবিদিত।

অনেক ছাত্রকে তিনি উচ্চ শিক্ষায় উৎসাহ যুগিয়েছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন। শিক্ষক হিসেবে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা আজও বয়স্ক প্রবীণদের স্মরণ করতে দেখা যায়। প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। আর তা হলো, কিরাত শিক্ষার প্রতি তার আগ্রহ। বলার অপেক্ষা রাখে না, রামপুর আলিয়া মাদরাসায় অধ্যয়নকালেই কিরাত বা তারতিল সহকারে

বিশুদ্ধ কুরআন পাঠ যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। ফলে, তিনি নিজে যেমন কিরাতের চর্চা করতেন, বিশুদ্ধ করে কুরআন পাঠ করতেন, তেমনি কিরাত শিক্ষার প্রতিও গুরুত্ব দিতেন। প্রিয়ভাজন ফুলতলী ছাহেব কিবলাহকে তিনি কিরাত শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেন শুরুতেই। ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী যে কিরাত শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন, বাংলা ভারত তো বটেই এবং এমনকি ইউরোপ ও আমেরিকাতেও কিরাত শিক্ষাকে প্রসারিত করে একটি বৈপ্লবিক অবদান রেখেছেন তার প্রাথমিক উৎসাহ এসেছিলো বদরপুরী (র.) এর কাছ থেকেই।

অধ্যায় : তিন

মুর্শিদের সান্নিধ্যে

হযরত বদরপুরীর আধ্যাত্মিকতা ওলায়তের প্রকাশ যেমন এক অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়ে, তেমনি তরীকতে দাখিল হয়ে বায়আত হওয়া ও খিলাফত লাভের ঘটনাটিও ছিলো খুবই বিস্ময়কর। আল্লাহর ওলীদের ক্ষেত্রে এভাবেই হওয়া স্বাভাবিক। যারা নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পন করার যত বেশি চেষ্টা করেন বা সমর্পিত হন, তারা আল্লাহ তাআলার ততো মহব্বত লাভ করেন। আর এই মহব্বতের মাধ্যমেই পরম প্রাপ্তি ঘটে নেক বান্দাগণের জীবনে। এ পর্যায়ে বান্দার কথা ও কাজ এমনকি দেহ পর্যন্ত আল্লাহর একান্ত নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। শয়তানের কোনো হুকুম চলেনা সেখানে।

বদরপুরী ছাহেব যখন ইলমে জাহির এর পাশাপাশি ইলমে বাতিন অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন অর্থাৎ দ্বীনি তথা শরয়ী ইলম এর পরিপূরক হিসেবে যখন নিজেকে তাসাউফে বা তরীকতে দাখিল হওয়ার তাগিদ অন্তরে পেলেন তখনও তিনি স্থিরভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না যে, কোন মুর্শিদের নিকট বায়আত করবেন। তাই তিনি মুর্শিদের সন্ধানে ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত বিষয়টি আল্লাহর ফয়সালার উপর সোপর্দ করে দয়াময়ের পক্ষ থেকে কোনো ইঙ্গিত লাভের আশায় দিন কাটাতে থাকেন। এ অবস্থায় একরাত্রে স্বপ্নে দেখেন হযরত মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (র.) এর ছাহেবজাদা ও খলীফা হযরত মাওলানা হাফিজ আহমদ জৌনপুরী ছাহেব তাকে আহ্বান জানাচ্ছেন। স্বপ্নটি তার জন্যে পরম পাওয়া একথা তিনি বুঝতে পারলেন। তিনি জানতে চাইলেন, কোথায় দেখা হবে। উত্তর পেলেন, বাংলাদেশের চাঁদপুর এসে সাক্ষাৎ করো। তাই কালবিলম্ব না করে সাক্ষাৎ

লাভের উদ্দেশ্যে পরদিনই তিনি রওয়ানা হয়ে গেলেন। হযরত হাফিজ আহমদ জৌনপুরী হিদায়াতের কাজে তখন বাংলাদেশের চাঁদপুরে অবস্থান করছিলেন। এদিকে হযরত হাফিজ আহমদ ছাহেব সঙ্গী-সাথীদেরকে এ মর্মে জানিয়ে দেন যে, আসাম অঞ্চল থেকে সাদা পোষাক পরিহিত উজ্জ্বল বর্ণের একজন আলিম তাঁর সাক্ষাৎ লাভের জন্যে আসবেন। এই মেহমানকে সাদরে গ্রহণ করে যেন তাঁর নিকট পৌছে দেওয়া হয়। তিনি আরও জানিয়ে দেন যে, এ মাওলানা সাহেবের নাম শাহ মুহম্মদ ইয়াকুব। ট্রেনের সময় হলে লোকজন খোঁজ নিতে ষ্টেশনে চলে যান। এক সময় বদরপুরী ছাহেব গিয়ে ট্রেন হতে নামেন। জৌনপুরী সাহেবের বর্ণনানুযায়ী খাদিমগণ তাকে চিনতে সময় লাগলো না। তবুও জিজ্ঞাসা করে নিশ্চিন্ত হলেন যে, তিনিই সেই মেহমান, শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব কিনা। জৌনপুরী ছাহেব তখন নিজের বজরায় (বড় নৌকায়) অবস্থান করছিলেন। সেখানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলে জৌনপুরী ছাহেব বজরা থেকে বের হয়ে আলিঙ্গন করলেন। নিজের কাঁধের তোয়ালে খানা বিছিয়ে বসতে দিলেন। বদরপুরী ছাহেব তোয়ালে খানা উঠিয়ে হাতে নিয়ে ভক্তি ভরে চুমু খেলেন। তখন উযূ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করে নিজের কামরায় তাকে নিয়ে গেলেন। কুশলাদির পর বললেন, কি চান? এভাবে কয়েকবার তাকে একই প্রশ্ন করলেন। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রতিবার বদরপুরী ছাহেব উত্তর দিলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এর সন্তুষ্টি চাই"। এরপর তাকে বায়আত করালেন এবং তা'লীম-তরবিয়াত দিলেন। এভাবে দু'তিন দিন তা'লীম-তাওয়াজ্জুহ'র মধ্য দিয়ে তরীকতের সকল স্তর অতিক্রম করিয়ে খিলাফতনামা প্রদান করে তাকে বললেন, এই সনদ আপনাকে প্রদান করার জন্যে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বদরপুরী ছাহেব সনদ খানা হাতে নিয়ে চুমু খেয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। এবার জৌনপুরী ছাহেব তাকে বিদায় দিলেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিলো আরও কয়েকদিন মুর্শিদের খিদমতে থেকে নিজেকে ধন্য করবেন। কিন্তু হযরত জৌনপুরী ছাহেব বেশ যজবার অবস্থায় বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা বদরপুরী ছাহেবের কলবের উপর সজোরে চাপ দিয়ে বললেন, যাও, সব কিছু হয়েছে। এবার তিনি জানতে চাইলেন, আবার কখন সাক্ষাৎ করবেন, জবাবে জৌনপুরী ছাহেব বললেন, আর সাক্ষাতের দরকার নেই, যা কিছু প্রয়োজন তা তিনি হাসিল করেছেন। কিছুক্ষণ নিরব থেকে বললেন, আর কখনো সাক্ষাৎ হবে না। বদরপুরী ছাহেব ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মুর্শিদের দরবার হতে বিদায় নিলেন। তাকে বিদায় দিয়ে জৌনপুরী ছাহেব কিবলাহ ঢাকার উদ্দেশ্যে বোট ছাড়ার নির্দেশ দিলেন। এ সফরেই বোট যখন ঢাকার সদরঘাটে পৌছলো, তখনই

হযরত মাওলানা হাফিজ আহমদ সিদ্দিকী জৌনপুরী (র.) ইন্তিকাল করেন। ঢাকার চকবাজার শাহী মসজিদের দক্ষিণ পাশে তিনি সমাহিত আছেন। কুতবুল আউলিয়া বদরপুরী ছাহেব কিবলাহকে খিলাফত ও তাওয়াজ্জুহ দেওয়ার দু'তিন দিন পরই তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন এবং এটাই তাঁর শেষ খিলাফত ও তাওয়াজ্জুহ ছিলো বলে জানা যায়। আরও জানা যায়, বদরপুরী ছাহেব তার মুর্শিদ হতে এস্বেছাতের তাওয়াজ্জুহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এভাবেই মুর্শিদের স্বল্প সময়ের সান্নিধ্য বা সোহবত বদরপুরী ছাহেবের জীবনে এনেছিলো অসাধারণ আধ্যাত্মিক বা রূহানী শক্তি যদ্বারা ইনসানিয়াতের উচ্চ মাকামে পৌছে তিনি প্রকৃত অর্থে আল্লাহর পরিচয় লাভে ধন্য হয়েছিলেন, ধন্য হয়েছিলেন রাসূল (সা.) এর মহব্বত লাভেও। আর এ আলো বিতরণ করে অনির্বান প্রদীপ জ্বালিয়ে গেছেন অসংখ্য, অগণিত দিশেহারা ও পথভুলা মানুষের হৃদয় কন্দরে। কি ইহলৌকিক কি পরলৌকিক দু'জাহানের অনন্য সাফল্য শুধু নিজেই লাভ করেননি, সর্ব সাধারণেও বিলিয়ে গেছেন সেই তরিকা, সেই পথ ও পদ্ধতি।

আধ্যাত্মিকতা

হযরত বদরপুরী (র.) তাঁর মুর্শিদ হযরত হাফিজ আহমদ সিদ্দিকী জৌনপুরী (র.) এর দরবার থেকে খিলাফত লাভ করে বদরপুর ফিরে আসেন। জীবনের এই অসাধারণ প্রাপ্তিকে আল্লাহর দয়া ও করুনা মনে করে নিজের মধ্যে গোপন রেখে যথারীতি অধ্যাপনার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছার উপর মানুষের মর্জি কোনোভাবেই কার্যকর নয়, ফলে কোনো সত্যই গোপন থাকেনা। সেটি ভাল বা মন্দ যা-ই হোক। বাগানে সদ্য ফোটা ফুল থেকে যেমন সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে, তেমনি আধ্যাত্মিক প্রতিভায় উদ্ভাসিত তরুণ মাওলানা ইয়াকুব এর সুনাম ছড়িয়ে পড়ল গোটা অঞ্চলে। শত চেষ্টা করেও নিজেকে আর আড়াল করে রাখতে পারলেন না, থাকতে পারলেন না মানুষের অগোচরে। দিক বিদিক থেকে লোকজন ছুটে আসতে লাগল তার খিদমতে। তার প্রখর মেধা, আসাধারণ পাণ্ডিত্য, উত্তম চরিত্র ও আমলের পরিপূর্ণতা মিশ্রিত মধুর বাণী মানুষকে চির সুন্দর, সরল-সঠিক পথের সন্ধান দিতে লাগল। দলে দলে লোক তাঁর হাতে বায়আত হলো। পথহারা লোকেরা তাঁর সান্নিধ্যে নতুন জীবন ফিরে পেয়ে স্বার্থক করতে লাগল তাদের জীবন। তিনিও অমৃত বাণী আর অন্তরের আলো দিয়ে দিশারী সেজে হিদায়াতের পথে মানুষকে টেনে আনতে লাগলেন। এইভাবে তিনি

জীবনভর মানুষকে ইসলামের ছায়াতলে এনে হিদায়াতের পথে চালিত করে গেছেন।

বাংলদেশের বিভিন্ন জেলা বিশেষ করে সিলেট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী ও ঢাকা ইত্যাদি বৃহত্তর জেলায় তাঁর বহুসংখ্যক মুরীদান রয়েছেন। ভারতের কাছাড়, নওয়াগাঁও, ডিব্রুগড়, লিডু, ডিগবয়, শিবনগর ও ষোড়হাট প্রভৃতি জেলাসমূহেও রয়েছে তাঁর ভক্ত-মুরীদান। এসকল জেলার সে সময়কার নাম করা আলিমগণও তাঁর নিকট বায়আত হয়ে ফয়েয লাভে ধন্য হন।

নবী প্রেম

পিয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসার মধ্যে রয়েছে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ এবং সফলতা উভয়ই। অন্তর দিয়ে তাঁকে ভালোবেসে একদল হয়েছিলেন সাহাবী, আর একদল মনে মনে ঘৃণা পোষণ করেই হয়েছিলো মুনাফিক। হুযুর (সা.) এর ভালোবাসা লাভ ও তাঁকে সৃষ্টির সকল কিছুর উপরে স্থান দেওয়া ঈমানের পরিপূর্ণতা।

হযরত বদরপুরী (র.) নিজে যেমন আল্লাহর রাসূলের একনিষ্ঠ আশিক ছিলেন, তেমনি হুযুর (সা.) এর ভালোবাসা লাভেও তিনি ছিলেন ধন্য। হুযুর (সা.) এর প্রিয়পাত্র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। অসংখ্য ঘটনাবলি থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন রাসূল (সা.) এর দীদার লাভে ধন্য এক অনন্য আশিকে রাসূল।

হুযুর (সা.) এর দীদার

কুতুবে যামান হযরত বদরপুরী (র.) যে কত বড় আশিকে রাসূল ছিলেন, তা তাঁর জীবনের বহু ঘটনা থেকেই জানা যায়। নবী করীম (সা.) এর সাথে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক এতোই প্রবল ছিলো, যার দরুণ অসংখ্যবার তিনি দীদারে নববীর বরকত লাভে ধন্য হয়েছেন। আল্লাহর নবীর দীদার নসীব হওয়ার প্রাক মুহূর্তে তিনি এতোই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তেন যে শান্তশিষ্ট স্বভাবের এই মহান বুযুর্গের উচাটন ভাব অবলোকন করে বিবি সাহেবা খুবই চিন্তান্বিত হয়ে পড়তেন। শুভ মুহূর্তের প্রাক্কালে বিবি সাহেবাকে মুসাল্লা বিছিয়ে দিতে ও দরজা বন্ধ করে অন্য কামরায় চলে যেতে নির্দেশ দিতেন। বিশেষ একদিনের ঘটনা ঃ ছাহেব বাড়ির উত্তরের ভিটায় যে ঘরে ছাহেবজাদা মো. হাবিবুর রহমান থাকতেন, ছাহেব কিবলাহ একদিন দুপুরের দিকে ঐ ঘরে তাশরীফ

নিলেন। ছাহেবজাদা তখন স্কুলে। ছাহেব কিবলাহ তখন দীদারে নববীর বরকতে ধন্য হলেন। পরপরই বিবি সাহেবাকে ঐ ঘরের বিশেষ জায়গার মেঝে থেকে উপরের মাটি তুলে ফেলে পুকুরের এক কোণে সযত্নে রাখানোর নির্দেশ দিলেন। ছাহেবজাদা হাবিবুর রহমান বাড়িতে এসে তার ঘরের মেঝের উপরের কিছু মাটি সরানো দেখতে পেয়ে মাকে পীড়াপীড়ি করে মাটি কাটার কারণ জানতে পারলেন যে, প্রিয় নবী (সা.) এর পরশ মাখানো সে স্থানের মাটি কেউ যাতে পা দিয়ে মাড়াতে না পারে তাই ছাহেব কিবলাহ বরকতময় মাটিকে ঐ রূপে সংরক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

হযরত বদরপুরী (র.) এর জীবনে হুযুর পাক (সা.) এর দীদার লাভের অনেক ঘটনা রয়েছে। রাসূলে কারীম (সা.) এর পবিত্র মুহব্বতে ধন্য অন্তর দীদারে আকাদ্দাসের বরকতে বহুবারই ধন্য হয়েছে। প্রথম দিকে 'নবী প্রেম' অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে মোটামুটি আলোকপাত করা হয়েছে।

বুযুর্গানের দৃষ্টিতে আশিকে রাসূল বদরপুরী (র.)

হযরত বদরপুরী (র.) আশিকে রাসূল হিসেবে যে কত উঁচু দরজার ছিলেন, সমকালীন বুযুর্গদের মধ্যে তা রীতিমতো আলোচনার বিষয় ছিলো। সুন্নাতে নববীর পরিপূর্ণ অনুসারী হিসেবেও তিনি ছিলেন যামানার বেনজীর দৃষ্টান্ত। মহব্বতে এলাহীর জ্যোতিষ্মান কলবের অধিকারী এই বুযুর্গ দীদারে নববীর পরশেও ছিলেন ধন্য। সমকালীন আশিকে রাসূল মুহতারাম বুযুর্গানে কিরাম বদরপুরী ছাহেব কিবলাহকে একজন মকবুল ওলী-আল্লাহ হিসেবেই বিবেচনা করতেন। এমনও অনেক বুযুর্গ যারা রাসূলে মকবুল (সা.) এর দীদারে ধন্য হতেন প্রায়ই, তারা আক্ষেপের সূরে বলতেন, 'আল্লাহর রাসূলের দরবারে বদরপুরী ছাহেব কিবলাহ'র স্থান কতো যে উর্ধ্বে তা হুযুরে পাক (সা.) এর পবিত্র জবানীতেই পাওয়া যায়। দীদারে আকাদ্দাছ কখনো নসীব হলে, আরও কিছু সময় দীদার দানে ধন্য করতে আরয করলে জবাব আসে, আমার আশিক বুন্দাশীলের মুহাম্মদ ইয়াকুব পেরেশান অন্তরে অপেক্ষায় আছে, তার তৃষ্ণাকাতর নয়ন আমাকে টানছে গভীরভাবে'। আশিকে রাসূল ঐসব বুজর্গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, মাওলানা ফিরোজ আলী ছাহেব করমপুরী (র.), মাওলানা কারী নাছির উদ্দিন ছাহেব নাথপুরী (র.), আশিকে রাসূল কারী নজীব আলী রতনপুরী (র.), পাথর কান্দির মাওলানা মোহাম্মদ আলী নূর ছাহেব (র.), লাঠিমারার মাওলানা মুবাশ্বির আলী ছাহেব (র.), নাজাতপুরের কারী ছাহেব, হযরত মাওলানা কারী আব্দুন নূর গড়কাপনী

(র.), মুবাশ্বির আলী তেলিটিকরী (র.), বিশেষ করে মাদারপুরের দরবেশ ছাহেব যিনি দীদারে আকাদ্দাছে ধন্য হিসেবে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি প্রায়ই আক্ষেপ করে বলতেন, 'আমার পূর্বদিকে যদি বুন্দাশীলের (বদরপুরের) ছাহেব না থাকতেন তবে একটু শান্তিভরে হুযুর (সা.) এর চেহারায়ে আনওয়ার দেখতে পারতাম এবং কথা বলারও সৌভাগ্য হতো। আফসোস! বদরপুরী ছাহেবের আকর্ষনের কাছে সে সুযোগ পরাহত।' আশিকে রাসূল, হুযুর (সা.) এর পবিত্র দীদার লাভে ধন্য কুতুবে যামান হযরত বদরপুরী (র.) সমকালীন বুযুর্গানের মাঝে ছিলেন এমনই সমুজ্জ্বল।

সৈয়দ বংশীয়দের প্রতি সম্মান

সৈয়দ বংশীয় বা নবীর খান্দানের প্রতি সকলেই সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন। হুযুর (সা.) এর সাথে তাদের বংশ পরম্পরা রয়েছে বলে যুগ যুগ ধরে তারা সকলের নিকট মর্যাদা ও সম্মান পেয়ে আসছেন। তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ভালোবাসা পোষণ নবী করীম (সা.) এর ভালোবাসা লাভেরও অন্যতম উপায়। আশিকে রাসূলগণের নিকট সৈয়দ বংশীয়গণের কদর এ কারণেই বেশি হয়ে থাকে। হযরত বদরপুরী (র.) এর মতো একজন আশিকে রাসূলের জীবনে এমন অনেক ঘটনাই রয়েছে যা থেকে নবী বংশীয়দের প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা ও আন্তরিক ভালোবাসা স্পষ্ট হয়ে উঠে। এ সম্পর্কে হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) একটি অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, একবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এখতিয়ারপুর সফর শেষে ছাতিয়াইন ষ্টেশনে হযরত বদরপুরী ছাহেবকে নিয়ে আমরা ট্রেনে উঠলাম। শায়েস্তাগঞ্জ আসার পর ১৩/১৪ বছরের একজন বালক আমাদের কামরায় উঠলেন। ছাহেব কিবলাহ সেই বালকের চেহারার দিকে কিছু সময় তাকিয়ে বসা থেকে দাঁড়িয়ে মাথার রুমাল খুলে বিছিয়ে দিয়ে বালককে তাতে বসতে অনুরোধ করলেন। বালক এতে কিছুটা বিস্মিত হয়ে বসতে ইতস্তত করলেন। ছাহেব কিবলাহ তাকে জোর করে বসালেন। আর কোনো কথা বললেন না। গাড়ি লস্করপুর ষ্টেশনে পৌঁছার পর বালক নেমে পড়লেন। তখন ছাহেব কিবলাহ আমাদের কৌতুহলী মনোভাব বুঝতে পেরে নিজেই ফরমালেন, আমার চক্ষে ভাসলো যে, তিনি কোনো সৈয়দজাদা হবেন, তাই তাঁর সম্মানে এমনটি করেছি। আমি (ফুলতলী ছাহেব) সাথে সাথে ট্রেন থেকে নেমে সেই ছেলের নিকট বাড়ি কোথায় জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, দাউদ নগর। বললাম, সৈয়দ

আবদুল্লাহ ছাহেব আপনার কি হন? বললেন, তিনি আমার দাদা। এই ঘটনার মাধ্যমে ছাহেব কিবলাহর অন্তর্দৃষ্টির প্রখরতা ও সৈয়দ বংশের তাজীম সারা জীবন আমার জন্য নসীহত হয়ে থাকবে।

বদরপুরী (র.) সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী

হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর নিকট কুলাউড়ার দেওয়ান জানু মিয়া সাহেব বর্ণনা করেন, আমি মনসুরের মাওলানা নসিব আলী ছাহেব (র.) এর নিকট বাল্য বয়সে মুরীদ হয়েছিলাম। তাঁর ইন্তিকালের সময় আমি বললাম, বড় আশা নিয়ে আপনার নিকট তরীকতে দাখিল হয়েছিলাম। কিন্তু, আজ আমাদের ছেড়ে আপনি চলে যাচ্ছেন, আমরা কি ফয়েয থেকে বঞ্চিত থাকবো? শুনে তিনি বলেছিলেন, জানু মিয়া! তুমি নিরাশ না হয়ে নিজের নৌকায় পাল বেঁধে দিয়ে বসে থাক। পশ্চিমের বাতাসে তোমার নৌকাকে বদরপুরের ঘাটে পৌছিয়ে দেবে। আর এভাবেই তোমার মনের আশা পূর্ণ হবে। তাঁর কথামতো নিজের বাসনাকে মনের মধ্যে চাপা রেখে বসে থাকি। দীর্ঘ দিন পর হযরত বদরপুরী ছাহেব কিবলাহর জৌনপুরী ছাহেবের নিকট থেকে খিলাফত লাভের কথা শুনে তার নিকট গিয়ে বায়আত হই। উল্লেখ্য, নসিব আলী (র.) যখন বদরপুর গিয়ে নৌকা ভিড়ার কথা বলেছিলেন, তখনও বদরপুরী ছাহেব তরীকতে দাখিল হননি। অথচ, তাঁর ওলায়াতের ভবিষ্যদ্বাণী সেই বুযুর্গ অনেক আগেই করে রেখে গেছেন।

অধ্যায় : চার

পথ-পদ্ধতি

আল্লাহর নেক বান্দা ও সুন্নাতে রাসূলের একনিষ্ঠ অনুসারী হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থে একজন আশিকে রাসূল (সা.)। নবী করীম (সা.) এর প্রেম সাগরে অবগাহন করেই যা যা সম্ভব তিনি তাতেই মনে প্রাণে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদায় শুধু নিজেই সুষ্ঠ বিশ্বাসী ছিলেন না বরং আজীবন মানুষের অন্তরে আল্লাহ ও রাসূল প্রেম জাগিয়ে তোলার পাশাপাশি তিনি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন সঠিক আকিদায় বিশ্বাসী হতে। তিনি মনে করতেন, ইবাদত-বন্দেগীর চেয়ে ঈমান-আকিদা বিশুদ্ধ করা মানুষের প্রথম কর্তব্য। হানাফী মাযহাবের পূর্ণ অনুসারী এই সাধক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের খিলাফ ভ্রান্ত বা গোমরাহ আকিদা পোষণকারীদের বিরুদ্ধে ছিলেন এক সোচ্চার কণ্ঠ।

ওয়াজ-নসীহত

ভালো কাজের আদেশ, মন্দকাজে নিষেধ, দুনিয়ার জীবনের সামগ্রিক দিক নির্দেশনা ও আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ তথা আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টির পথে বক্তব্য দ্বারা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার নাম ওয়াজ-নসীহত। বক্তার প্রতি মানুষের গ্রহণযোগ্যতা, আস্থা, বিশ্বাস, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা এবং বক্তার আন্তরিকতা, সততা, ঈমান-আকিদা, আমল-আখলাকের পরিপূর্ণতা, তথ্য নির্ভর উপস্থাপনা ইত্যাদির উপর ওয়াজ-নসীহতের ফলাফল অনেকাংশে নির্ভর করে।

বিশেষ করে উলামায়ে কিরামগণের মধ্যে যারা ইলম ও আখলাকে পরিপূর্ণ এবং পরহেজগারী যাদের মধ্যে রয়েছে তাদের কথায় মানুষ বিশ্বাস করে এবং কথামতো জীবন পরিচালনায় উৎসাহী হয়ে থাকে।

পরিপূর্ণ ও অনন্য গুণাবলির অধিকারী হযরত বদরপুরী (র.) ছিলেন সকলের কাছে বিশ্বস্থ ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। জীবনের প্রায় অর্ধশতাধিক বছর তিনি অন্যান্য দ্বীনি খিদমতের পাশাপাশি ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে হিদায়াতের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি সিলেট ও আসাম অঞ্চলের মাদরাসা, মক্তবসহ বহু প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এ সকল অঞ্চলের বড় বড় সভায় তিনি উপস্থিত না হয়ে পারতেন না। তিনি স্পষ্ট ভাষায়, মিষ্ট মধুর স্বরে, অল্প কথায়, সারগর্ভ আলোচনা করতেন। শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেই তাঁর কথা থেকে উপকৃত হতো। প্রয়োজনের তাগিদে যা যা বলা দরকার তাতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তিনি ছিলেন আমল ও পরহেজগারীতে শীর্ষে, তাই তাঁর কথায় ও নসীহতে লোকজনের মধ্যে পরিবর্তন আসতো।

তাঁর মাহফিলে অনেক দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসতো লোকজন। তার কথা শুনে মানুষ যেন অন্য জগতে চলে যেতো। সবাই কাদতো। সভাস্থলে নেমে আসতো শোকের ছায়া। যতক্ষণ তিনি কথা বলতেন, সভাস্থল নীরব হয়ে থাকতো। সে সময় মাইকের প্রচলন ছিলোনা বলে কণ্ঠস্বরের দ্বারা যতটুকু সম্ভব শোনা যেতো। তিনি অত্যন্ত ধীর স্বরে প্রাঞ্জল ভাষায় কথা বলতেন অথচ বড় বড় মাহফিলের সকল লোকই তা ভালোভাবে শুনতে পেতো। এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য বা কারামতও বলা যায়। জ্ঞানী, গুণী আলিমগণ তাঁর বয়ান খেয়াল করে শুনতেন। তাঁর মধ্যে আল্লাহ এতো মকবুলিয়াত দান করেছিলেন যে, তিনি যা বলতেন, মানুষ তাতেই কেঁদে আকুল হয়ে পড়তো।

তাঁর বয়ানের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) বলেন, একবার সিলেট সদরের রেঙ্গা দাউদপুরের এক মাহফিলে হযরত বদরপুরী (র.) তাশরীফ নিলেন। সভা মঞ্চে আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে ছাহেব পার্শ্ববর্তী তুড়ুকখলায় চলে গেলেন। আমার তখনো বিয়ে হয়নি। সভাস্থলে মুসলিম লীগ ও জমিয়তের পতাকা তুলা নিয়ে বেশ তোড়জোড় চলছিলো। আমি কোনো মতে বিবাদ থামিয়ে ওয়াজ শুরু করলাম। যুহরের সময় ছাহেব কিবলাহ মাহফিলে তাশরীফ আনলেন। নামায পড়েই বয়ান শুরু করলেন। আমাকে চেয়ারে বসে থাকার হুকুম করলেন, আমি না বসে নিচেই বসলাম। বয়ানের এক পর্যায়ে যখন কিয়ামতের বিভিশিকার কথা বিশেষ করে ফিরিশতাগণ আরশ নিয়ে কিভাবে নামবেন, এই ঘটনা বলতে আরম্ভ করলেন, তখন মাটিতে ভূ-কম্পন অনুভুত হল। আমি নিজেও চেয়ারের পায়া ধরে বসে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। সারা মাহফিল জুড়ে একই অবস্থার সৃষ্টি হলো। সকলেই যেন কিয়ামতের অবস্থা দেখতে পাচ্ছিল। উপস্থিত সকলে মন্তব্য করেছিলেন যে, হযরত বদরপুরী ছাহেবের বয়ানে সেদিন মনে হয়েছিলো কিয়ামত শুরু হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে একদিন ফুলতলী মাদরাসার সভায় ছাহেব যখন বয়ান করছিলেন, তখন লোকদের মধ্যে অনেকেই চিৎকার দিয়ে কাঁদতে শুরু করেন। ক্রমে সারা মাহফিলেই কান্নার আওয়াজ ও চিৎকার শুনা গেলো। কিছু লোক বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। এর মধ্যে কানাইঘাটের জুলাই নিবাসী মাওলানা আবদুল মজিদ ছাহেবের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। দীর্ঘ সময় মাথায় পানি দেওয়ার পর তাঁর জ্ঞান ফিরেছিলো।

বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত

হযরত বদরপুরী (র.) বিজ্ঞ আলিম ও মশহুর ওলী হওয়ার পাশাপাশি কুরআনুল কারীমের বিশুদ্ধ তিলাওয়াতে পারদর্শী বা খ্যাতনামা কারীও

ছিলেন। তাজবীদ সহকারে সঠিক উচ্চারণের সাথে তিনি কিরাত পড়তে ও কিরাত বিশুদ্ধ করার জন্য সকলকে বিশেষ করে আলিম-উলামাদের কঠোরভাবে তাগিদ দিতেন। সময় সুযোগে নিজেও সহায়তা করতেন। কোনো আলিম তাঁর কাছে এলে তিনি কিরাত শুনতেন এবং সংশোধনীর পরামর্শ দিতেন। কিরাত বিশুদ্ধ না হলে নামায শুদ্ধ হবেনা আর নামায শুদ্ধ না হলে কোনো ইবাদতই কাজে আসবে না, এ নসীহতটি তিনি সব সময় করতেন। বিশুদ্ধ কিরাতের গুরুত্ব তাঁর নিকট অত্যন্ত বেশি ছিলো। যে জন্য জৌনপুরী ছাহেব থেকে খিলাফত লাভের পর জকিগঞ্জে ইনামতি মোকামে গিয়ে তিনি ইলমে কিরাত শিক্ষা করেছিলেন। তাঁর কিরাতের উস্তাদ ছিলেন, হযরত কারী আবদুল মজিদ (র.), সিলেটের গোলাপগঞ্জ থানার হেতিমগঞ্জের মস্কাপুর ছিলো তাঁর বাড়ি।

হযরত বদরপুরী (র.) এর নির্দেশে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিরাতের মাদরাসা স্থাপন করা হয়েছিলো। হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) তাঁর কাছে প্রথমে কিরাত শিক্ষা করেন এবং পরবর্তীতে তাঁর নির্দেশে প্রথমে হযরত মাওলানা হাফিজ আবদুর রউফ চৌধুরী করমপুরী (র.) ও পরবর্তীতে মক্কা শরীফে বিশ্ব বিখ্যাত কারী রইছুল কুররা শেখ আহমদ হেযাযী মক্কী (র.) এর নিকট থেকে বিশুদ্ধ কুরআন পাক তিলাওয়াতের সনদ লাভ করেন। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর বর্তমান বিশ্বব্যাপি কুরআন শরীফ বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের যে বিপ্লব 'দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট' এর মাধ্যমে অব্যাহতভাবে দিন দিন আরও অগ্রসর হচ্ছে, তাতে হযরত বদরপুরীর অনুপ্রেরণা ও অবদান সবচেয়ে বেশি। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহও সব সময় অশ্রুভেজা নয়নে মুর্শিদের কথা এভাবেই স্মরণ করেন।

বদরপুরী (র.) শেষ বয়সে অর্থাৎ তাঁর বয়স একশ বছরের বেশি হওয়ার পরও কুরআন শরীফের হরফের উচ্চারণ বা বিশুদ্ধ পাঠে কোনো অসুবিধা হতো না। দাঁত না থাকা অবস্থায়ও তিনি তারতীলের সাথে তিলাওয়াত করতে পারতেন।

পাক-পবিত্রতা ও ইবাদত

সার্বক্ষণিক পাক-পবিত্র বা উযূর সাথে থাকা তাঁর নিয়মিত অভ্যাস ছিলো। উযূ অবস্থায় থাকতেন সারা দিন ও রাতের বেশির ভাগ সময়। দৈনন্দিন গোসল ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা তিনি পছন্দ করতেন। সারা দিনই কোনো না কোনোভাবে ইবাদতে মশগুল থাকতেন। বিনিদ্র রজনী বা রাতভর ইবাদত করেও কাটাতেন। কুরআন তিলাওয়াত ও ওযীফা পাঠসহ দুআ-দরূদ পাঠ করতেন। নামায আদায় করতেন তিনি একাগ্র মনে। তাঁর নামায দেখে কেউ

অভিভূত না হয়ে পারত না। তিনি নামাযে ইমামতিকালে যেভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতেন, তাতে অধিকাংশ মুসল্লিদের চোখেই পানি এসে যেতো। মাঝে মধ্যে তাসবীহও ব্যবহার করতেন। মোটকথা, তাঁর দৈনন্দিন সকল কার্যাবলিই ছিলো ইবাদতের শামিল। শত ব্যস্ততার ফাঁকে তিনি রুটিনের পরিবর্তন না করে ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন।

গভীর রাতে তিনি আল্লাহর দরবারে বিনীত সুরে কেঁদে মোনাজাত করতেন। অনেক সময় বিশেষ বিশেষ শায়র বা গজল আবৃত্তি করে কাঁদতেন। শেষ রাতে হাফিজের নিম্নোক্ত ফার্সী বায়আত প্রায়ই তাকে পড়ে কাঁদতে দেখা যেতো।

'মুরাদর মনজিলে জানা চে আমনুওয়ে শে চু হরদম,
জরছ ফরইয়াদমী দ-রদ্ কে বর বন্দীদ মহমিলহা।'
'চে বন্দে দিল দরি দুনিয়া কে রোজে চন্দে মেহমানী',
কে নাগা মুরগে পেশ আঁয়দ খুরী আদম পশীমানী।'

অর্থাৎ
"যে পথে যাচ্ছি আমি বন্ধুর ঘরে
সে পথ সারাক্ষণ কন্টকাকীর্ণ
বিবেকে ধ্বনিত হচ্ছে–
যে বাহনে যাচ্ছো শক্ত করে
ধরো তা!

দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কি লাভ
এতো মাত্র ক'দিনের আতিথ্য
অকস্মাৎ মৃত্যু এসে গেলে হতে হবে অনুতপ্ত তাকে।"

তাওয়াক্কুল ও পরহেজগারী

তাওয়াক্কুল ও পরহেজগারীতা কামিল মুমিনদের বৈশিষ্ট্য। তিনি এ সকল গুণাবলিতে এতো বেশি অগ্রসর ছিলেন যে, তাঁর ন্যায় পরহেজগার ও মোতাওয়াক্কিল বা আল্লাহর উপর নির্ভরশীল খুব কমই দেখা যেতো। নিজের সকল কিছুর ফয়সালা বা সমাধান একাগ্রচিত্তে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন। মানুষকে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হতে নসীহত করতেন। তিনি বলতেন, "যাই হোক বা ঘটুক সবই আল্লাহর মর্জিতে হয়ে থাকে।" আর তাঁর ক্ষেত্রে বাস্তবেও তাই হতো। তাঁর কোনো সমস্যা দেখা দিলে চূড়ান্ত পর্যায়ের আগেই কুদরতীভাবেই তার সমাধান হয়ে যেতো।

আর পরহেজগারী তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। তিনি লোক দেখানো পরহেজগারীতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। এটা পছন্দও করতেন না। তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য জীবন ও কর্ম তাকওয়া ও পরহেজগারীর আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখতেন।

অধ্যায় : পাঁচ

সমকালীনতা

ব্রিটিশ ঔপনিবেশ আমলের শেষ পর্যায় থেকে হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হওয়া পর্যন্ত সময়কাল ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য খুব একটা শান্তির বা নিরাপদ ছিলো না। তবুও মুসলমানদের মধ্যে আজকের মতো এত দলাদলি, কোন্দল বা সংঘাত ছিলোনা। দল-মত নির্বিশেষে বৃহত্তম মুসলিম জাতি-গোষ্ঠির পরিচয়ই তখন পেতো প্রাধান্য। নিজেদের মধ্যে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি সে সময় ছিলোনা। মত-পথের পার্থক্য থাকলেও গুণীজন যে দলেরই হোন না কেন, তাকে সকলেই সমীহ বা সম্মান করতো। সকলের আন্দোলন বা সংগ্রামের কর্মসূচিও ছিলো এক ও অভিন্ন। বিধর্মীদের চক্রান্ত মোকাবেলায় ইসলাম ও মুসলমানদের জাতিসত্বা টিকিয়ে রাখা।

হিন্দুস্থান-পাকিস্তান প্রসঙ্গ নিয়ে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইত্যাদি সে সময়কার ঘটনা। বলার অপেক্ষা রাখে না, তখন মুসলমানদের ঈমান-আকিদা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ সবই ছিলো উন্নত। আজকের মতো এতো দল বা ফিতনা সে যুগে ছিলোনা। সঠিক আকিদায় বিশ্বাসী মুসলমানদের নিকট উদ্ভট কোনো বিষয়ই স্থান পেতোনা। আলিম-উলামা, পীর-মাশায়িখদেরকে সকলে সম্মান ও মান্য করতো। বিজ্ঞান ও চিকিৎসা পদ্ধতি এতো উন্নত ছিলোনা। কোনো অসুখ-বিসুখে আলিম-উলামাদের দুআ তাবিজই অনেক ক্ষেত্রে ছিলো শেষ ভরসা। কুরআনী তদবিরেই সর্বসাধারণ পরিতৃপ্তি লাভ করতো। মক্তব, মাদরাসা আর আলিম-উলামাও এতো সস্তা বা সহজলভ্য ব্যাপার ছিলো না। দুআ-তাবিজের জন্য বহু দূর দূরান্ত থেকে লোকজন ছুটে আসতো বুযুর্গদের নিকট। সে সময় ভণ্ড-লোভীদের সংখ্যা প্রায় ছিলোনা বলেই মানুষ কামিল ওলীদের দ্বারা উপকৃত হতো সর্বোতভাবে।

পীরানে পীর হযরত বদরপুরী (র.) এর নিকট সিলেট, কাছাড় তথা আসাম অঞ্চলের অগণিত লোক মুরীদ ছিলো। সমকালীন বহুসংখ্যক উলামাও তার নিকট বায়আত ছিলেন। সে সময়ে এতদাঞ্চলে প্রায় আলিমই তাঁর নিকট বায়আত ছিলেন এবং তাঁর ছাত্র ছিলেন। আর যারা মুরীদ বা ছাত্র ছিলেন না তারাও আন্তরিকভাবে তাকে শ্রদ্ধা করতেন। অর্থাৎ সমকালীন প্রেক্ষাপটে

উলামা সমাজের কদর ছিলো যথাযথ, আর বদরপুরী (র.) সেক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তাঁর সান্নিধ্যে যারা আসতেন বা তাঁকে দেখতেন তাদের মধ্যে অল্প সময়েই একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতো। আল্লাহ ও রাসূল প্রেম জাগিয়ে তুলতে তাঁর জুড়ি ছিলো না। তাঁর রূহানী শক্তি এতো প্রখর ছিলো যে, কোনো কাফিরের উপর বিশেষ নজর বা খেয়াল ফরমালে সাথে সাথে তার অবস্থার উন্নতি ঘটত। বহুসংখ্যক বিধর্মী তাঁর নিকট ইসলাম কবূল করে ধন্য হয়েছিলো। উলামায়ে কিরামগণ রূহানী শক্তির প্রখরতার জন্য তাঁকে 'কুতবুল আউলিয়া' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

রাজনৈতিক চিন্তাধারা

হযরত বদরপুরী (র.) যামানার অন্যতম ওলী-আল্লাহ ও খ্যাতনামা আলিম হওয়ার পাশাপাশি একজন দেশ প্রেমিক এবং মানব সেবী ব্যক্তিত্বও ছিলেন। প্রজ্ঞা, মেধা ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে তাঁর মধ্যে বিরাজ করত উন্নতমানের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও চেতনা। পূর্বসূরী বুযুর্গগন থেকে তরীকতের পাশাপাশি এই চেতনা ও শিক্ষা রপ্ত করেছিলেন তিনি। দেশ-জাতির প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ তাঁকে নিরব দর্শকের ভূমিকায় সকলের নিকট প্রিয় হয়ে বসে থাকার পরিবর্তে তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিলো স্পষ্টতা। প্রচলিত রাজনীতির মধ্যে তিনি সক্রিয় না থাকলেও দেশের গতিধারা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশেষ করে মুসলমানদের স্বার্থ কোন দিকে এগুচ্ছে সে ব্যাপারে তিনি সতর্ক ছিলেন। যখন যেভাবে সম্ভব উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা বা সহযোগিতায় তিনি কুণ্ঠাবোধ করতেন না। সভা-সমাবেশে বক্তৃতা দ্বারা। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, পরামর্শ সভায় যোগদান করে, এমনকি গভীর রাতে দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা করে তিনি দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় ও বিরুদ্ধবাদীদের ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় জোরালো ভূমিকা রেখে গেছেন। শত্রু দ্বারা কোন বিপদ বা খোদায়ী গজব অত্যাসন্ন হলে তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তেন। সরাসরি বিপদের কথা না বলে ইঙ্গিত করতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি প্রায় মাহফিলে কুরআনুল কারীমের "যাহারাল ফাসাদু ফিল বাররি ওয়াল বাহরি বিমা কাছাবাত আইদিন নাছ" এর শেষ আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করে মানুষকে সতর্ক করতেন এবং বেশি করে কাঁদতেন।

তিনি খিলাফত আন্দোলনের সময় মুসলমানদের উৎসাহী করার জন্য যে পংক্তি রচনা করে আবৃত্তি করতেন, তার ভাবার্থ ছিলো, 'হে পথভ্রষ্ঠ মুসলমান! ইসলামের সম্মান বাড়াবার জন্য পা সামনে আগাও, শেষ ফলাফলের চিন্তা করোনা।'

তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মাওলানা মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী, মহাত্মাগান্ধী, সি.আর দাস, প্রমুখ নেতাদের পক্ষে সার্বিক সহযোগিতা করেন। লর্ড হান্টার কর্তৃক সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া আন্দোলনকে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার।

দল, মত নির্বিশেষে সকলের সাথে মিলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা ও সর্বাবস্থায় নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতে রাখার কামনায় তিনি ছিলেন আপোষহীন। সে সময় সিলেটে উলামাদের এক বৈঠক আহ্বান করা হয়। মাওলানা আবদুল মোছাব্বির চৌধুরী প্রমুখ উলামায়ে কিরামগণ তাদের নেতৃস্থানীয় হিসেবে হযরত বদরপুরীকে উক্ত বৈঠকে উপস্থিত করেন। তিনি অত্যন্ত সাহসের সাথে তাদেরকে সামনে অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ ও উৎসাহ দেন। সাথে সাথে তিনি আরও বলেন যে, নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতে থাকা জরুরী। নতুবা অমুসলমানদের নিকট মুসলমানদের ধোকা খাওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মদনী ছাহেবসহ সে সময়কার নেতৃস্থানীয় উলামাদেরও তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে উৎসাহ দিয়ে দুআ করতেন। মদনী ছাহেব সময় সুযোগে তার সাথে সাক্ষাৎ, পরামর্শ ও দুআ নিতেন। হযরত বদরপুরী ছাহেবও মদনী ছাহেবকে খুব সমীহ ও সমাদর করতেন। বলার অপেক্ষা রাখেনা সে সময়কার তরুন প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব হযরত ফুলতলী ছাহেব ও বদরপুরী বড় ছাহেবজাদা মুর্শিদ ও পিতার নির্দেশ ও অনুপ্রেরণায় স্বাধীনতা আন্দোলনে জোরালো ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

খিলাফত আন্দোলনের সময় হযরত বদরপুরী ছাহেব সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে সকল দলকেই উৎসাহ দিতেন। বিশেষভাবে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দকে স্বাধীনতার দাবীতে সামনে অগ্রসর হওয়ার খুবই তাগিদ দিতেন।

মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস এর মধ্যে যখন দ্বন্দ ছিলো তখন তিনি ছিলেন অনেকাংশে নীরব। তার দাবী ছিলো, মুসলমানদের আযাদী প্রয়োজন। কোনো পার্টিকে বিশেষ সমর্থন না দিয়ে তিনি সকল দলকেই আযাদীর পথে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বলতেন। তাঁর দাবী ছিলো একটাই যে, ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতে থাকতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক কর্ম

আল্লাহর বন্দেগী, হুযুর (সা.) এর মহব্বত হাসিল এবং মানব সেবায় উৎসর্গীকৃত ছিলো হযরত বদরপুরী (র.) এর জীবন। বহুসংখ্যক মাদরাসা,

মক্তব, মসজিদ, ঈদগাহ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠায় তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও অবদানের কথা আজও সর্ব মহলে সুবিদিত। কখনো নিজেই উদ্যোগ নিয়েছেন আবার কখনো মুরীদানদের নির্দেশ দিয়ে দেশ-বিদেশের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠা করেছেন এসব প্রতিষ্ঠান। এগুলো থেকে আজও উচ্চারিত হচ্ছে আল্লাহর যিকিরের সূর মুর্চনা।

বদরপুর মাদরাসা

বদরপুরে নিজ বাড়ি সংলগ্ন যে মাদরাসা তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং নিজের মেধা ও শ্রম দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন, একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে সেই বদরপুর আলিয়া মাদরাসা কয়েক যুগ পেরিয়ে আজও তার স্মৃতি বহন করে চলেছে। বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত শিক্ষার্থীগণ এই মাদরাসা থেকে শিক্ষা লাভ করে গিয়ে নিজেরাও শিক্ষকতায় নিয়োজিত হতেন। গোটা আসাম রাজ্যের মধ্যে একসময় এটিই ছিলো সুনামধন্য ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র। এই মাদরাসায় মেধা ও শারীরিক শ্রমই তিনি দেননি; দিয়েছিলেন নিজের বহু অর্থ সম্পদও। কারও দিকে না তাকিয়ে সর্বদা নিজেই ব্যয়ভার মিটাতেন। অন্যান্যভাবে কোনো সাহায্য আসলে তাও তিনি গ্রহণ করতেন। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত পড়ার সুযোগ ছিলো এই মাদরাসায়। সে সময়ের বড় বড় আলিমদের অধিকাংশই এই মাদরাসার ছাত্র ছিলেন। পরবর্তীতে মাদরাসাটি ভারতের সরকারি তালিকাভুক্ত হয়। বড় ছাহেবজাদা মাওলানা মাহমুদুর রহমান ছাহেব দীর্ঘ দিন এই মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সম্প্রতি সরকারি উদ্যোগে এই মাদরাসায় বদরপুরী (র.) এর নামে একটি ছাত্রাবাস নির্মিত হচ্ছে।

সাহিত্য প্রতিভা

বদরপুরী (র.) এর উল্লেখযোগ্য কোনো লেখনী বা কিতাবাদি না থাকলেও তিনি একজন সুলেখক ছিলেন। সকলকে আল্লাহ্ সব কাজের জন্য মনোনীত করেন না। হিদায়াত ও তরীকতের খিদমতের অবসরে বড় ধরণের কোনো রচনা তাঁর হয়ত সম্ভব হয়ে উঠেনি। শিক্ষকতায় থাকাকালে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে অর্থবহ বিভিন্ন রচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখার দায়িত্ব তার উপর ছিলো। তিনি বিভিন্ন ভাষায় অত্যন্ত চমকপ্রদ প্রবন্ধ রচনা করে উপস্থিত সকলের প্রশংসা পেতেন।

তিনি আরবী, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় কবিতা লিখতেন। শিক্ষিত মহলে তা সমাদৃত হতো, প্রশংসিত হতো। একবার কাঠিগড়া মাদরাসায় শিক্ষকতাকালে ইংরেজ অফিসার মাদরাসা পরিদর্শনে এলে তিনি একটি কবিতা রচনা করেন। ইংরেজ অফিসার এর ভাবার্থ ও ছন্দ বিন্যাস দেখে এতোই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁর সম্মানার্থে মাদরাসায় বড় অঙ্কের অনুদান দিয়েছিলেন। কাজেই বলার অপেক্ষা রাখেনা, তিনি ছিলেন উঁচু মানের এক সাহিত্যিক প্রতিভা। ক্লাসে কঠিন বিষয়গুলো তিনি পড়াতেন। পাঠ আলোচনায় তিনি যে সারগর্ভ প্রাথমিক বক্তব্য রাখতেন তা নোট করে ছাত্ররা উপকৃত হতো।

'মোনাজাতে ইয়াকুবী' নামক তাঁর রচিত উর্দু ভাষায় একটি পুস্তিকা রয়েছে। তরীকতের বুযুর্গানের নামের ওয়াছিলা সম্বলিত সুপাঠ্য ও সুদীর্ঘ এই মুনাজাত বিরাদরানে তরীকত মকবুল দুআ হিসেবে আমল করে থাকেন।

অধ্যায় : ছয়

দৈহিক গঠন

হযরত বদরপুরী (র.) একদিকে যেমন মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তেমনি তাঁর দৈহিক গঠনও ছিলো সুন্দর-নিখুঁত। ব্যক্তিত্বের সাথে মিল করেই যেন তাঁকে তৈরি করা হয়েছে এটা বুঝা যেতো সহজেই। দৈহিক সৌন্দর্য, স্বভাব-চরিত্র, আর কথা-বার্তায় চমৎকার সমন্বয় ছিলো তাঁর মাঝে।

সৌম্য-শান্ত উজ্জ্বল দীপ্ত বর্ণ, হালকা গড়ন, কাঁধ পর্যন্ত সুবিন্যস্ত চুল, উন্নত নাক ও আকর্ষণীয় চোখের অধিকারী ছিলেন তিনি। চোখ দুটি কি যেন খুঁজে ফিরতো সারাক্ষণ। এমন কাউকে পাওয়া যায়নি যিনি বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে পারতেন তাঁর চোখের দিকে। তাঁর চোখ দিয়ে দীপ্তি ছড়াতো।

হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর ভাষায় তাঁর ন্যায় এতো সুন্দর দেহের ও উত্তম গুণের অধিকারী আর কাউকে তিনি দেখেননি। তিনি আরও বলেন, সে সময়কার হিন্দু, খ্রিষ্টান বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা প্রায়ই ছাহেব কিবলাহর খিদমতে আসতো। তাঁকে দেখে কিছু বলার কথা ভুলে তন্ময় হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতো। অপরাপর যারাই তাঁকে দেখেছেন সকলেই এই মন্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেছেন। বদরপুরের বিভিন্ন বয়সী লোকের নিকট তথ্যের জন্য আমি নিজেও গিয়েছি, সকলের কথা একটাই যে, ছাহেবতো ছিলেন বেনজির, বেমিসাল, তাঁর সম্পর্কে আর কি বলব। শারীরিক গঠনে তিনি বেশী লম্বা বা বেশী মোটা ছিলেন না, আবার বেটে বা হালকা-পাতলাও ছিলেন না। ত্বক ছিলো সাদার উপর লালের প্রলেপ লাগানো।

শতাধিক বছর বয়সেও তাঁর চেহারার সৌন্দর্য বা লাবণ্য অটুট ছিলো। তাঁর দিকে তাকালেই বুঝা যেতো তিনি কতটা শান্ত ভাব-গম্ভীর। হাতের আঙুলির গড়ন, হাত ও পা দেখে মনে হতো, অভিজ্ঞ শিল্পীর নিখুঁত কারুকাজ, যার প্রশংসা না করে পারা যেতো না। মোটকথা, প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন একজন সুপুরুষ।

স্বভাব-চরিত্র

উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেন বদরপুরী (র.) এর ছিলো অনেকটাই মজ্জাগত। বহুমুখী গুণের অধিকারী ছাহেব কিবলাহর স্বভাব ছিলো নম্র মাধুর্যে ভরপুর। তিনি খুব কম কথা বলতেন। মিষ্ট-নম্র স্বরে অল্প যে কয়েকটা কথা বলতেন তাতেই সবাই কেবল মুগ্ধ হতোনা; পরিতৃপ্ত হতো বা পুরো উত্তর পেয়ে যেতো। কোনো কোনো সময় দেখা যেতো কোনো লোক দীর্ঘ বিষয়ের

অবতারণা করলে তিনি শান্তভাবে অল্প কথায় এর সুষ্ঠু সমাধান বা উত্তর দিতেন। আর কিছু বলার অবকাশ থাকতো না। অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলা বা শুনার চেয়ে নীরব থাকতে অথবা হামদ-না'ত শুনতে তিনি পছন্দ করতেন।
ধীর-গম্ভীর চিত্তে কথা যেমন বলতেন, চলাফেরাও করতেন অত্যন্ত সন্তর্পণে এবং ধীর পদক্ষেপে। অথচ, সচরাচর দেখা যেতো তাঁর সাথে হেঁটে কারও পক্ষে সম্ভব হচ্ছেনা। মাথা নিচু করে হাঁটতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন।
তাঁর স্বভাব ছিলো নম্র, ভদ্র, লাজুক ও উদার প্রকৃতির। অত্যন্ত সংযমী ছিলেন এবং আল্লাহর প্রতি তাঁর ভরসা ছিলো অত্যাধিক।
যার জন্য কোনো কিছুতে বেশি বিচলিত হতেন না। অল্পেই তুষ্ট থাকতেন। সব কিছুর প্রতি সচেতনভাবে নজর রাখতেন। গুরুতর রাগ তিনি কখনো করতেন না বা রাগ করলেও কোনো গালমন্দতো দূরের কথা, কোনো প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করতেন না। তবে এসময় তাঁর সুন্দর চেহারায় লাল রং এর একটা আভা ফুটে উঠতো।

বিনয়-নম্রতা

আল্লাহর ওলীগণ বিনয়ী বা নম্র স্বভাবের হয়ে থাকেন। বিনয় ও নম্রতার দ্বারাই প্রকৃত সমর্পণ সম্ভব। আর সমর্পণই প্রাপ্তির হাতিয়ার। কেবল আল্লাহ মহানের হুজুরে নিজেকে নগণ্য ভেবে সমর্পণ করে সর্বসাধারণের নিকট নিজেকে বড় ভাবাও অহংকার। তাই ওলীগণ সর্বাবস্থায় নিজেকে অতি তুচ্ছ বা আল্লাহর এক নগণ্য বান্দা মনে করেন। মানুষকে তার প্রাপ্য হিসেবে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া গুণীজনদের বৈশিষ্ট্য। হযরত বদরপুরী (র.) ছিলেন এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি কাউকে ছোট মনে করে অবহেলা করতেন না। ধনী-গরীব ও উঁচু-নিচু ভেদাভেদ তিনি কখনো করতেন না। আল্লাহর পথে অগ্রসর মুত্তাকী এবং পরহেজগারদের গুরুত্ব ও মর্যাদা ছিলো তার নিকট বিবেচ্য। শরীআত বিরোধী নাফরমান প্রকৃতির লোককেও তিনি তাড়িয়ে না দিয়ে হিকমত অবলম্বনের মাধ্যমে হিদায়াতের চেষ্টা করতেন। তাতে ভয়ে কেউ নিরাশ হতোনা। মানুষের দুঃখ-কষ্টে তিনি সত্যিকারভাবে ব্যথিত হতেন এবং চিন্তিতও হতেন। তাদের জন্য দুআ করতেন। তার বিনয়-নম্র আচরণ অনেক বিপথগামী ফাসিক-ফাজির লোককেও হিদায়াত লাভে ধন্য করেছে। তার স্বভাব-আচরণ যেভাবে বিনয়-নম্র ছিলো তেমনি আল্লাহর দরবারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনীত। দুআর সময় তিনি এতো বিনীত ও ব্যাকুল হতেন যে, মজলিসে উপস্থিত কোনো লোকই স্থির থাকতে পারতো না। সবাই কেঁদে

ব্যাকুল হয়ে যেতো। এমনকি তাঁর কথা শুনেও মানুষ কেঁদে ব্যাকুল হয়ে পড়তো। তার উজ্জ্বল দ্বীপ্ত চেহারায় সব সময় কাঁদো কাঁদো ভাব ও চোখের কোণে পানি জমা হয়ে থাকতে দেখা যেতো। যার কারণে শেষ বয়সে তিনি দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। আল্লাহর দরবারে যখন তিনি হাত তুলে মোনাজাত করতেন, তখন এমনভাবে কাঁদতেন, মনে হতো ছোট শিশু ক্ষুধার জ্বালার কথা তার অবচেতন মাকে জানিয়ে দিচ্ছে।

সত্যবাদিতা

সত্য-মিথ্যা, হক-নাহক বা ন্যায়-অন্যায়ের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আপোষহীন। তিনি ছিলেন স্পষ্টভাষী এবং সত্যবাদি। যে কারণে কোনো মিথ্যা কথা বা সত্য গোপন করা তাঁর নিকট অসহনীয় ছিলো। এমতাবস্থায় তাঁর চেহারার ভাব-ভঙ্গী বদলে গিয়ে মুখে লালের আবা ফুটে উঠতো। সত্যকথা বা সৎকাজে কাউকে বিলম্ব করতে দেখলে আড়চোখে রাগতভাবে তাকাতেন। এ সময় তাঁর দুই গালে নারাজির চিহ্ন দেখা যেতো। কোনো কোনো সময় তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন। মুসলমান মিথ্যা কথা বলতে পারে এটা সহজে তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাছাড়া গীবত বা পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদিতেও তিনি অত্যন্ত নারাজ হতেন, এমনকি মুখ ফিরিয়ে নিতেন, কখনো স্থান ত্যাগ করতে চেষ্টা করতেন। আবার কেউ কারও সামনে প্রশংসা করলে মনক্ষুন্ন হতেন এবং বলতেন, মুখে মাটি ছিটিয়ে দেওয়াই এমন প্রশংসাকারীর প্রাপ্য।

ওয়াদা পালন

তিনি ওয়াদা পালনের বিষয়ে খুবই সচেষ্ট ছিলেন। অবশ্য আল্লাহর ওলীদের দ্বারা ওয়াদার খেলাপ হওয়ার কথাও নয়। কিন্তু তিনি এব্যাপারে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি সতর্ক থাকা পছন্দ করতেন। যে কোনো প্রোগ্রাম বা ওয়াদা তিনি গুরুত্বের সাথে পালন করতেন। অনেক সময় দেখা যেতো পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচির দিনে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বা প্রভাবশালী শ্রেণির লোক এসে ভিন্ন কর্মসূচিতে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতেন। কিন্তু তিনি নির্ধারিত কর্মসূচির পরিবর্তন কখনো করতেন না।

আমানতদারী

হযরত বদরপুরী (র.) আমানতদারীর ব্যাপারে খুব সতর্ক ছিলেন। বিষয়টি তিনি যথাসাধ্য এড়িয়ে চলতেন। এরপরও মাঝে মধ্যে তাঁর নিকট বড় অঙ্কের আমানত এসে যেতো। বিশেষ করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বদরপুর মাদরাসা

পরিচালনার জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে টাকা আসতো বা তিনি সফরে গেলে তাঁর নিকট লোকজন দিয়ে থাকতো। তিনি সযত্নে টাকাগুলো সংরক্ষণ করতেন অথবা কাউকে রাখার নির্দেশ দিতেন। সফর শেষ করে বাড়ি ফিরার পূর্বেই পথে মাদরাসার কোষাধ্যক্ষ হাজী আম্বর আলী বা যে সময় যিনি দায়িত্বে থাকতেন তার নিকট পৌছিয়ে দিয়ে তারপর বাড়ি যেতেন। লোকজন তাকে আমীন বলে জানতো।

আচার-ব্যবহার

হযরত বদরপুরী (র.) এর কাছে গরীব-ধনীর কোনো ভেদাভেদ ছিলোনা। সমাজের সকল শ্রেণির লোক তাঁর কাছে উত্তম ব্যবহার পেয়ে থাকতেন। কাউকে গরীব ভেবে দূরে ঠেলে দেওয়া আর ধনী বলে কোলে তুলে নেওয়া ছিলো তাঁর নীতির পরিপন্থী। তিনি শিক্ষা বা জ্ঞানের একজন পৃষ্ঠপোষক ও সমাদরকারী ছিলেন। যে কারণে শিক্ষিত বা জ্ঞানী-গুণীদের অবশ্য কিছুটা আলাদা নজরে দেখতেন। পরিবার-পরিজন তথা সন্তানদের এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি কেবল মমতা আর ভালোবাসাই ছিলোনা, তাদের প্রতি তিনি যে আচার-ব্যবহার করতেন তা পরবর্তীতে অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে গণ্য হয়। সকলেই তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। সম্ভবতঃ কারও কোনো অসন্তুষ্টি থেকে তিনি সর্বদা মুক্ত ছিলেন।

সমাজের দীন-দুঃখী, উঁচু-নিচু সব শ্রেণির লোকেরা তাঁর নিকট থেকে আশানুরূপ ব্যবহার পেয়ে থাকতো। স্থানীয় হিন্দু অনেক পাঠনিও তাঁকে বাবা বলে ডাকতো। সময় সময় তাদেরকে তিনি আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতাও করতেন।

কাউকে তোষামোদ করা তাঁর নীতি বিরুদ্ধ ছিলো। সততার সাথে মিষ্ট স্বরে কথা বলে মানুষকে পাশে ডেকে নসীহত বা হিদায়াত করা ছিলো তাঁর অভ্যাস। মোটকথা, ছোট বড় সকলের সাথে উত্তম ব্যবহারের দরুণ তিনি যেমন ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র, তেমনি তাঁর ব্যবহার ছিলো অনুকরণীয়।

পোষাক-পরিচ্ছদ

বদরপুরী (র.) সাধারণ পোষাক-পরিচ্ছদে অভ্যস্থ ছিলেন। কোনো জাঁকঝমকপূর্ণ পোষাক পরে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষন ছিলো তাঁর নীতির পরিপন্থী। জামা-কাপড় সাধারণ হলেও পরিধানের পর তাঁর শরীরে এটি অসাধারণ মনে হতো। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা তিনি খুব পছন্দ করতেন। ফলে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন যে কোনো কাপড়ে তাঁকে মানাতো সুন্দর। সুন্দর অবয়ব ও

পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড় পরা বদরপুরী (র.) কে দেখলে কেউ চোখ ফিরাতে পারতো না।

তিনি সচরাচর পাগড়ী ব্যবহার করতেন। আর বেশিরভাগই সাদা পাগড়ী পরতেন। সাদা লুঙ্গি অথবা সেলোয়ার পরতেন। সব সময় তিনি পাঞ্জাবী হাঁটুর নীচ পর্যন্ত পরতেন।

লম্বা কিস্‌তি টুপি থাকতো মাথায়। চাদর তিনি ব্যবহার করতেন। সবুজ রং এর চাদর তাঁর বেশি পছন্দ ছিলো। অর্থাৎ, হুযুর (সা.) এর সুন্নাত অনুযায়ী তিনি পোষাক ব্যবহার করতেন। হাঁটা-চলা, কথা-বার্তা ও স্বভাব সব কিছুতে তাঁর মধ্যে ছিলো সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ। তিনি অত্যাধিক জাঁক-ঝমকপূর্ণ কাপড় পরিধান পছন্দ করতেন না। তবুও কেউ তাঁকে গরীব-মিসকিন যাতে না ভাবে সে দিকে লক্ষ্য রেখে পোষাক ব্যবহার করতেন।

দৈনন্দিন জীবন

হযরত বদরপুরী (র.) প্রায় একশত চার বছর বেঁচে ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন। ইন্তিকালের অনুমানিক আট বছর আগে থেকে তাঁর দৃষ্টি শক্তি লোপ পায়। তিনি সবকিছু দেখতে পারতেন না। বেশিরভাগ সময় চোখ বন্ধ করেই থাকতেন। কিন্তু যখন চোখ খুলতেন; দেখে মনে হতোনা যে, তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁকে দেখে বা তাঁর কাজ-কর্মেও মনে হতোনা যে, তিনি দেখেন না। এর আরও বছর চারেক আগে থেকে তিনি চলাফেরা করতে অক্ষম হয়ে পড়েন। যত দিন চলাফেরা করতে পারতেন, ততদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে মসজিদেই আদায় করতেন। ফজর নামাযের পর কিছু সময় ধ্যানমগ্ন হয়ে বসতেন। এরপর কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে চা-নাস্তা খেতেন। ততক্ষণে বাইরে লোকজন ভরে যেতো, তিনি তাদের সাক্ষাৎ দিতেন। ঘরে ফিরে সকালের খাবার খেতেন। খাওয়ার পর কিছু সময় বিশ্রাম নিতেন। বিশ্রাম শেষে গোসল এবং এরপর যুহরের নামায আদায় করতেন। এর মধ্যে বাইরে লোকজন অপেক্ষায় থাকলে তাদের সাথে দেখা করে নিতেন। নামায শেষে দুপুরের খাবার খেয়ে কিছু সময় বিশ্রাম নিতেন। আছরের নামায পড়ে বাইরে গিয়ে বসতেন এবং মানুষের সুখ-দুঃখের খবর নিয়ে তাবিজ-দুআ করে দিতেন। মাগরিবের নামায শেষে নিজ ঘরে ধ্যানে বসতেন। এশার নামাযের পূর্ব পর্যন্ত ধ্যানেই কাটাতেন। এশার নামায শেষে রাতের হালকা খাবার গ্রহণ করে বিশ্রাম নিতেন। মধ্যরাতে অর্থাৎ ১২ টার সময় বিশ্রাম থেকে জেগে উযূ করে নামায,

মুরাকাবা, তাসবীহ ইত্যাদিতে ব্যস্ত হতেন। রাতে আর তাঁর ঘুম হতোনা, এভাবেই ফজর পর্যন্ত জেগে থেকে ইবাদত-বন্দেগীতে কাটাতেন।

আহার-নিদ্রা

ওলী-আল্লাহ বা কামিল বুযুর্গদের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো, কম খাওয়া ও কম ঘুমানো। খাওয়া-দাওয়ায় হযরত বদরপুরীরও কোনো বিশেষ পছন্দ ছিলোনা। যখন যা সামনে আসতো তাই তিনি পরিতৃপ্তি সহকারে খেতেন। সব মানুষই দেহের সাথে মিল রেখে খাবার গ্রহণ করে থাকে, কিন্তু বদরপুরী ছাহেব কিবলাহ এতো অল্প খাবার খেতেন যে, বেঁচে থাকার জন্যও তা ছিলো নুন্যতম। এটাই ওলীদের বৈশিষ্ট্য। তারা ভুড়ি ভোজনকে ইবাদত-বন্দেগীর অন্তরায় মনে করেন। কারণ অধিক খাবার থেকে আলস্য সৃষ্টি হয়। খাবারের তুলনায় তাঁর ঘুমও ছিলো অতি অল্প। এশার পর থেকে মধ্যরাত্রি অর্থাৎ ১২টা পর্যন্ত তিনি ঘুমাতেন। এরপর জেগে ধ্যান-মুরাকাবা, নামায-বন্দেগী বা যিকির আযকারে ব্যস্ত থাকতেন। সকালের খাবার খেয়ে সামান্য সময় যদিও বিশ্রাম নিতেন কিন্তু ঘুমাতেন বলে মনে হতোনা। মধ্য রাতে জেগে অনেক সময় তিনি মসজিদে, নদীর পাড়ে অথবা দূরবর্তী পাহাড়ে চলে যেতেন। এ সম্পর্কে কিছু ঘটনা 'কারামত' অংশে উল্লেখিত হয়েছে।

স্মরণশক্তি

তিনি অত্যন্ত প্রখর মেধা ও প্রবল স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। শিক্ষা জীবনে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান তাঁর মেধার প্রমাণ বহন করে। তাঁর স্মরণ বা ইয়াদ শক্তি অসাধারণ ছিলো। কোনো কিছু একবার পড়লে আর তা ভুলতেন না। ছাত্রদের পাঠদানকালে দীর্ঘদিন পূর্বের ক্লাসের জের টেনে প্রসঙ্গের অবতারণা করতে পারতেন। একবার যাকে দেখতেন, দীর্ঘ দিন পর দেখা হলেও তাকে চিনতে পারতেন, এমনকি নাম-ঠিকানাও মনে রাখতে পারতেন। কুরআন, হাদীস ও ফিকহ ইত্যাদি সকল বিষয়ে তাঁর অসাধারণ মেধাই ছিলো না; বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ছিলো অগাধ পাণ্ডিত্য।

হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) বলেন, বিভিন্ন বিষয়ে কোনো দলীল তাঁর নিকট জানতে চাইলে তিনি একটু ধ্যান করে ঠিক ঠিক ভাবে কিতাবের উদ্ধৃতিসহ তা বলে দিতেন। আপাত দৃষ্টিতে এটা তাঁর মেধা বা স্মরণ শক্তির প্রখরতা মনে হলেও বস্তুতঃ এটা ছিলো তাঁর আধ্যাত্মিক বা রূহানী শক্তির জন্য।

একবার ভূগার উস্তাদ হাফিজ কারী মাওলানা আবদুর রউফ চৌধুরী করমপুরী ছাহেব ও বাহাদুরপুরের মাওলানা শফিকুল হক ছাহেবের মধ্যে কুরআন শরীফের "ইন্না বুরাউ মিনকুম" বাক্য নিয়ে বিতর্ক বাধলো। "বুরাউ" শব্দটি

লম্বা করে পড়তে হবে কিনা? করমপুরী ছাহেব এই শব্দকে শুধু 'হামযা' দিয়ে পড়ার পক্ষে মক্কা শরীফের তাঁর উস্তাদ ছাহেব এরূপ শিক্ষা দিয়েছেন বলে তিনি দাবী করেন। অপর দিকে বাহাদুরপুরী ছাহেব বললেন, যেহেতু এখানে 'ওয়াও' এর উপর 'হামযা' এবং পরে আলিফ রয়েছে তাই আলোচ্য শব্দটি লম্বা করেই পড়তে হবে। কোনো সমাধান না হওয়াতে তারা উভয়েই আমাকে (ফুলতলী ছাহেব) এই বিষয়ে অভিজ্ঞ বলে সালিশ মেনে আমার নিকট চিঠি লিখলেন। আমি চিঠি পেয়ে রীতিমতো চিন্তায় পড়ে গেলাম যে, এর সমাধান কিভাবে করা যায়। অবশেষে বদরপুর গিয়ে ছাহেব কিবলাহর খিদমতে বিষয়টির কথা জানালাম। ছাহেব কিবলাহ শুনে মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, এটা মিমাংসার জন্য তোমাকে কিছু বলতে হবে না, এমনিতেই এর সমাধান হয়ে যাবে। তাফসীরে রূহুল মাআনী বের করে দেখো, ইমাম আলুসী (র.) অতিরিক্ত কোনো একটি অক্ষরও না লিখে ইমাম হাফ্স (র.) এর কিরাত অনুযায়ী তাঁর তাফসীরে লিখেছেন। তাফসীর বের করে দেখলাম, সেখানে 'ওয়াও' ও 'আলিফ' নেই। কেবল 'হামযা' দিয়েই লিখেছেন। কিতাব নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে চিঠি দিয়ে তারিখ জানিয়ে দিলাম যে, আমি এই তারিখে এই বিষয়ের সমাধান দিতে আসছি। নির্ধারিত তারিখে তাঁদের নিকট উপস্থিত হয়ে তাফসীরখানা খুলে বাহাদুরপুরী ছাহেবের সামনে রাখলাম। তিনি পড়ে নিয়ে হেসে বললেন, হাফিজ ছাহেব আপনি জয়ী হয়ে গেছেন। হাফিজ ছাহেব তার ভগ্নিপতি ছিলেন।

এভাবে অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যা তিনি অত্যন্ত সহজে বলে দিতে পারতেন, অনেক খাটাখাটির পরও তা খুঁজে পাওয়া সম্ভব হতো না। যখন কুরআন শরীফের সূরা 'ফাতিহা' এর 'দ্বোয়াদ' শব্দকে 'জোয়াদ' এর উচ্চারণে পড়া নিয়ে উলামাদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হলো, তখন 'জোয়াদ' পড়া যে ভুল, তার দলীল হযরত বদরপুরী ছাহেব কিতাব থেকে বের করে দেন। উলামারা তা নোট করে নেন। একথা কারও জানা ছিলোনা যে, 'দ্বোয়াদ' শব্দকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করে 'জোয়াদ' পড়লে ঈমান থাকবে না। ইমাম আবূ হানিফা (র.) এর ফিকহে আকবর'সহ রীদ্ব, মুফাস্সাল, দারবুর্দি, নওয়াজিরুল উসূল ইত্যাদি কিতাবাদী থেকে বদরপুরী ছাহেব কিবলাহ এই বিষয়ে চূড়ান্ত ফতওয়া প্রস্তুত করে দেন।

সুগন্ধি ব্যবহার

সুগন্ধি ছিলো তাঁর খুব প্রিয়। সর্বদা আতর ব্যবহার করতেন। ব্যবসায়ীগণ ভালো-ভালো আতর দুআ নেওয়ার জন্য তাঁকে হাদিয়া দিতেন। তিনি নিজে ব্যবহার করতেন এবং অন্যদের মাঝে তা বিতরণ করতেন। নাকে ও দাড়িতে সুগন্ধি লাগানোর পর তাঁকে খুব উৎফুল্ল মনে হতো।

অধ্যায় : সাত

পারিবারিক জীবন

সাদাসিধা অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হযরত বদরপুরী (র.) এর পারিবারিক জীবন ছিলো পুরোপুরি তার নিয়ন্ত্রণে। প্রথমদিকে বৈবাহিক জীবনে দুটি বিচ্ছেদ সম্ভবতঃ অনাড়ম্বর বনাম আড়ম্বরের সংঘাত প্রসূত বলে অনুমিত হয়। তবে এ ব্যাপারে ভিন্ন কোনো কারণ থাকাও বিচিত্র নয়। প্রথম বিচ্ছেদের পর তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন বদরপুরের খাদিমানে। এক কন্যা সন্তান রেখে এই বিবি ইন্তিকাল করেন। এরপর দেওরাইলে যে বিবাহ করেন, কিছুদিনের মধ্যে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটলে তিনি পুনরায় বিবাহ করেন নিজ গ্রামে আনুমানিক ১৩১২ বাংলা সনে। এরপর খুবই সুন্দর পরিচ্ছন্ন দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হয়। শেষ জীবন পর্যন্ত এই বিবি তাঁর খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বদরপুরী ছাহেব কিবলাহর ইন্তিকালের প্রায় ৩০ বছর পর পর্যন্ত জীবিত থেকে আল্লাহর বন্দেগীতে মশগুল ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরহেজগার ও আবিদা ছিলেন। ১৯৮৪ ইংরেজি সনের ২০ মে, মোতাবেক ৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯১ বাংলা সনে রবিবার সন্ধ্যা ৫ টায় তিনি বদরপুর ছাহেব বাড়িতে ইন্তিকাল করেন।

এই বিবির গর্ভে হযরত বদরপুরী (র.) এর ছয়জন ছাহেবজাদা ও দুই ছাহেবজাদী জন্মগ্রহণ করেন। তারা হলেন,

১. হযরত মাওলানা মাহমুদুর রহমান, তিনি ছাহেব কিবলাহর বড় ছাহেবজাদা। সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল পাশ করেন। ছাহেব কিবলাহর জীবদ্দশা থেকে বদরপুর আলিয়া মাদরাসায় প্রথমে শিক্ষকতা ও পরবর্তীতে অধ্যক্ষ হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করে বর্তমানে অবসর জীবন-যাপন করছেন। উল্লেখ্য, তিনিই ছাহেব কিবলাহর গাদ্দীনশীন।

২. দ্বিতীয় ছাহেবজাদা জনাব মো. হাবিবুর রহমান। খ্যাতিমান গবেষক ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। উন্নত চরিত্র ও মেধার অধিকারী, তিনি ছিলেন সংসার বিমূখ । তিনি কোনো বিবাহ করেননি। এ অবস্থায় কয়েক বছর আগে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৩. তৃতীয় ছাহেবজাদা জনাব মৌঃ মখলিছুর রহমান। কর্মজীবনে তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী।

৪. চতুর্থ ছাহেবজাদা মাওলানা মো. আজিজুর রহমান। তিনি খুব প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন। একজন বিজ্ঞ আলিম ও তিব্বিয়া কলেজ পাশ অভিজ্ঞ হাকিম ছিলেন তিনি। হযরত বদরপুরী (র.) এর জীবদ্দশায় তিনি মজ্জুব হয়ে যান। তিনিও বিবাহ করেননি। এই অবস্থায় তিনি ১৯৭৪ ইংরেজি সনে ইন্তিকাল করেন।

৫. পঞ্চম ছাহেবজাদা মাওলানা মো. ইবাদুর রহমান। যিনি একজন খ্যাতনামা আলিম ও অভিজ্ঞ হাকিম। তিনি পেশায় ইউনানী চিকিৎসক।

৬. ষষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ছাহেবজাদা জনাব মো. বশির আহমদ। কর্ম জীবনে তিনি ব্যবসাকে বেছে নেন। সফল ব্যবসায়ী হিসেবে তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। হযরত বদরপুরী (র.) এর দ্বিতীয় বিবির গর্ভে যে ছাহেবজাদী ছিলেন তার নাম মাহমুদা খাতুন। পাশ্ববর্তী এলাকায় তার বিবাহ হয়। ছোট ছাহেবানীর গর্ভে দুই ছাহেবজাদী ছিলেন। তারা বয়সে বড় ছাহেবজাদার ছোট এবং অন্যান্য ভাইদের বড় ছিলেন। তারা হলেন,

১. আয়েশা খাতুন। সিলেট জেলার জকিগঞ্জ থানার মানিকপুর গ্রামে তার বিয়ে হয়। তিন ছেলে ও দুই মেয়ে। ছেলেগণ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং গুরুত্বপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন।

২. কনিষ্ঠ ছাহেবজাদী খোদেজা খাতুনকে হযরত বদরপুরী (র.) তাঁর অতি প্রিয়ভাজন খলীফা হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর নিকট বিবাহ দেন।

তাঁর গর্ভে হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর যথাক্রমে বড় চার ছাহেবজাদা। ও তিন ছাহেবজাদী জন্মগ্রহণ করেন। বদরপুরী ছাহেব কিবলাহ জীবিত অবস্থায় এই ছাহেবজাদী সংসার বিরাগী হয়ে পড়েন। অর্থাৎ, কোলাহল মুক্ত থেকে সন্তান, সংসারের প্রতি বিমুখ হয়ে গিয়ে বন্ধ ঘরে ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল হয়ে যান। আজ পর্যন্ত তিনি একইভাবে ফুলতলীতে একাকী দিন যাপন করছেন। তবে, যত দিন যাচ্ছে ইদানিং অনেকটা স্বাভাবিকতায় ফিরে আসছেন বলে মনে হচ্ছে।

তাঁর সংসার বিমুখ হওয়ার পর বদরপুরী (র.) নিজ জামাতা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহকে দ্বিতীয় বিবাহের নির্দেশ দেন। তাঁরই সম্মতিক্রমে ফুলতলী গ্রামের মরহুম আবদুর রশীদ খান সাহেবের কনিষ্ঠ কন্যাকে ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ

(র.) বিবাহ করেন। বর্তমানে তিনি ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর খিদমতে রয়েছেন। তাঁর গর্ভে ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর ছোট তিন ছাহেবজাদা জন্মগ্রহণ করেন।

সমাজ-সংসার

হযরত বদরপুরী (র.) সংসার বিরাগী ছিলেন না। ইসলামের যে মর্মবাহী রাসূল (সা.) এর জীবনে বাস্তব রূপ লাভ করেছিলো সে সম্পর্কে তার ধ্যান-ধারণা ছিলো অত্যন্ত স্পষ্ট ও গভীর।

সংসার জীবনে তিনি তা অনুসরণ করেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে। বদরপুরী (র.) এর সংসার জীবন ছিলো শান্ত-স্নিগ্ধ-সুন্দর। আর্থিক দিক দিয়ে মধ্যবিত্ত হলেও সহজ স্বাচ্ছন্দ্য ছিলো তাঁর সংসার। সুন্দর ঘরবাড়ি, রুচিসম্মতভাবে সাজানো-গোছানো। ক্ষেতখামারের আবাদ-ফলন ছিলো চলনসই। তিনি এসব ব্যাপারেও ছিলেন সচেতন। নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখতেন।

হযরত বদরপুরী (র.) সন্তানদের সব সময়ই স্নেহ-আদর দিয়ে লালন-পালন করেছেন। তাদের নানা বায়না-আবদার মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং যথাসম্ভব পূরণও করেছেন। সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও করেছেন। এক্ষেত্রে বিশেষ করে পুত্র সন্তানদের নিজস্ব রুচি ও ইচ্ছাকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছেন। নিজের ইচ্ছা ও রুচিকে কখনো জোর করে চাপিয়ে দিতে চাননি।

এ কারণেই দেখা যায়, ছাহেবজাদাদের অনেকেই আধুনিক শিক্ষা গ্রহণেও এগিয়ে গেছেন। তবে, তাদের সবাইকে নূন্যতম ইসলামী শিক্ষা শুরুতেই গ্রহণ করতে হয়েছে। পরিবারের কারও প্রতি দায়িত্ব পালনে হযরত বদরপুরী (র.) এর কোনো উদাসীনতা ছিলো না। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ সংসারী মানুষ।

শুধু পরিবারের সদস্যদের প্রতি নয়, আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশী সকলের প্রতিও তিনি সমভাবে দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করেছেন। অনেক সময়ই কর্তব্যের চেয়ে বেশি খেয়াল রাখতেন। এছাড়া গরীব-মিসকিনদের দান-খয়রাত যেমন করতেন অকাতরে, তেমনি মেহমান-মুসাফিরদের সেবা-যত্নও করতেন আন্তরিকতার সাথে। তাদের থাকা-খাওয়া ও আরাম-আয়েশের ব্যবস্থার খোঁজ-খবর রাখা ছিলো তাঁর দৈনন্দিন কাজের রুটিন। বাড়ির চাকর-নকরদের প্রতি তিনি সর্বদাই ছিলেন স্নেহশীল, দয়াদ্র। এমনকি, পশু-পাখির প্রতিও তাঁর এই দয়াশীলতা ছিলো সমান সজাগ।

বিচার-সালিশ

আল্লাহর ওলীদের দ্বারা মানুষ কেবল পরকালের সাফল্য লাভে সহায়তা পায়না; দুনিয়ার সামগ্রিক কার্যাবলিতেও তাঁদের অবদান থাকে। বদরপুরী (র.) ইলমে জাহির, ইলমে বাতিন চর্চার পাশাপাশি একজন উঁচু মানের সামাজিক ব্যক্তিত্ব বা সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। সমাজের প্রতি কর্তব্য বলতে যা যা বুঝায় এ সবেও তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। বিশেষ করে সমাজের নিপীড়িত-অসহায় মানুষকে তিনি যথেষ্টভাবে সহযোগিতা করতেন। বিচার-আচার যথাসম্ভব তিনি এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু কোনো মজলুম ন্যায্য বিচার থেকে বঞ্চিত হতে দেখলে তিনি সোচ্চার না হয়ে পারতেন না। এ কারণেই অনেক সময় বড় বড় বিচার-সালিশ তিনি না করে পারতেন না। তখন কণ্ঠে শালীনতা বা ভদ্রতা বজায় রেখে সুষ্ঠু বিচার করে দিতেন। ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের বিপক্ষে রায় দিতে তার কোনো কুণ্ঠাবোধ ছিলোনা। আবার বেশিরভাগ সময় স্থানীয় গণ্যমান্য মুরব্বীদেরকেই বিষয়টি দেখে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতেন। সকলেই তা মেনে নিতো। কারও কোনো আপত্তি থাকতো না।

দান-খয়রাত

তিনি অত্যাধিক ধন-সম্পদের অধিকারী ছিলেন না, আবার অভাবীও ছিলেন না। তাঁর জীবন-যাপন ছিলো সচ্ছল ও স্বাভাবিক। সঞ্চয় করে সম্পদ রাখার চেয়ে দান-খয়রাত বা ভালো কাজে ব্যয় করাকে তিনি বেশী পছন্দ করতেন। নিজের পরনের জামা বা লুঙ্গি ফকীর-মিসকিনদের দান করতে পারতেন তিনি অকাতরে। এটি তাঁর অতি সাধারণ এক অভ্যাস ছিলো। বাল্য বয়স থেকেই দান-খয়রাতে তাঁর খ্যাতি এতো বেশী ছিলো যে, লোকজন দাতা হাতিম তাঈ এর সাথে তাঁকে তুলনা করতো। এমনকি প্রকৃত নামের আড়ালে 'হাতিম আলী ছাহেব' নামে তিনি সমধিক পরিচিতিও লাভ করেছিলেন।

দেশ-বিদেশের বহু লোক তাঁর খিদমতে প্রচুর টাকা-পয়সা হাদিয়া পাঠাতো। কোনো গরীব লোক হাদিয়া দিলে তিনি প্রায়ই তা হাতে নিয়ে খুশি মনে ফিরিয়ে দিতেন। বলতেন, আমি পেয়ে গেছি; এখন আপনাকে দিলাম কিছু খেয়ে নেবেন বা কোনো প্রয়োজনে লাগাবেন। অনেক সময় হাদিয়া গ্রহণ করে অন্যজনকে দিয়ে বলতেন, নিজের অভাব পূরণ করে নিও। অথবা গরীব-দুঃখী দেখে খয়রাত বা আল্লাহর নামে শিরনী করে বিতরণ করতে বলতেন। কাউকে নিজ ঘরের ছাউনি ঠিক করে নিতেও বলতেন। তিনি বাড়িতে অবস্থানকালে প্রায় প্রতিদিন মুরীদদের মধ্যে অভাবী-দায়গ্রস্থ অথবা

পথিক-মুসাফির মিলে ত্রিশ-চল্লিশজন লোক মেহমানখানায় রাতে থাকতো। তিনি তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা দিতেন এবং নিজে এসব তদারকীও করতেন। দূর-দূরান্তের অভাবী লোকদেরকে গন্তব্য পর্যন্ত পৌছার টাকা-পয়সা বা পথ খরচ দিয়ে অনেক সময় সাহায্য করতেন। গরীব-মিসকিনদের ঘর বানানোর কাজে অনেক বড় অঙ্কের টাকা দিতেও তাকে দেখা যেতো। অনেক বড় অঙ্কের টাকা কোনো সময় হাতে নিয়ে বারান্দায় রাখা মাদরাসার দান বাক্সে রেখে দিতে নির্দেশ দিতেন। গরীবদের প্রতি তাঁর দরদ ছিলো অত্যধিক। দান-খয়রাত করতে গিয়ে অনেক সময় নিজে শূন্য হয়ে যেতেন। তিনি সফরে গেলে লোকজন অনেক টাকা হাদিয়া পেশ করতো, বাড়ি ফিরে তা শীঘ্র হাত ছাড়া করে নিতেন। কখনো সমুদয় টাকা বদরপুর মাদরাসায় দিয়ে দিতেন। তাঁর নিকট এতো টাকা-পয়সা জমা হতো যে, সেগুলো সঞ্চয় করলে তিনি রাজার হালতে জীবন কাটাতে পারতেন। কিন্তু তাঁর তৃপ্তি ছিলো, কোনো মানুষ যেন তাঁর নিকট থেকে বিমুখ বা রিক্ত হাতে ফিরে না যায়। আজীবন এই নীতিতে থেকেছেন এবং আল্লাহ তাঁকে সফলও করেছিলেন। কোনো কাজের জন্য কোনো লোকই কখনো তাঁর উপর নারাজ হয়ে ফিরে যায়নি।

মেহমানদারী ও শিরণী বিতরণ

মেহমান-মুসাফিরদের সেবা-যত্ন বা খাওয়াতে তিনি নিয়মিত অভ্যস্থ ছিলেন। এতে তিনি খুবই তৃপ্তি লাভ করতেন। প্রতিদিন তাঁর সাক্ষাৎ পেতে অসংখ্য লোকজন আসতো, তিনি সকলের মেহমানদারী করতেন। গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথ এবং রেল জংশন নিকটে থাকায় পথিক-মুসাফিরদের অবস্থান নিয়মিত ব্যাপার ছিলো। সকলের থাকা-খাওয়া ছাহেব বাড়িতে নিশ্চিত ছিলো। খাদ্য দ্রব্যে এতো বরকত আল্লাহ্ দিতেন যে, কখনো পাঁচজনের খাবারে বিশ জন খেয়েও পরিতৃপ্তি লাভ করতো। এরকম পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ সময় তিনি নিজেই খাদ্য পরিবেশন করতেন।

একবার বিশিষ্ট কয়েকজন মুরীদান ফাণ্ড করে পৃথক পাক করে মেহমানদের খিদমত করার অনুমতি চাইলে ছাহেব কিবলাহ বলেছিলেন, এই পাক-শাক বা মেহমানদের খিদমতের সাওয়াব আমি ছাড়তে পারিনা। অর্থাৎ আমাকেই করতে দিন।

তাছাড়া, তিনি শিরণী বিতরণেও খুব আগ্রহী ও অভ্যস্থ ছিলেন। প্রায় প্রতি সপ্তাহে এক দুই বার শিরণীর ব্যবস্থা করে বিতরণ করতেন। অভাবী, গরীব-মিসকিন এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে তিনি শিরণী বিতরণ করতে

বেশি আনন্দ পেতেন। কেউ দান-খয়রাতের জন্য পরামর্শ চাইলে তিনি শিরণী করে বিতরণ করতে পরামর্শ দিতেন। বিশেষ বিশেষ দিন ও রাতে নিজের উদ্যোগে বড় আকারে শিরণীর ব্যবস্থা করতেন।

চিকিৎসক হিসেবে

চিকিৎসা শাস্ত্রের আজ অনেক উন্নতি হয়েছে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে মানুষ ইউনানী চিকিৎসায় অনেকটা নির্ভরশীল ছিলো। বদরপুরী (র.) কোনো চিকিৎসক ছিলেন না। তবুও চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ করে ইউনানী বা হেকিমী চিকিৎসা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রাখতেন। তিনি মানুষের আত্মা ও রূহের চিকিৎসক হওয়ার পাশাপাশি শরীরের চিকিৎসার মাধ্যমেও মানব সেবায় নিবেদিত ছিলেন। এমনকি হেকিম-ডাক্তারগণ কখনও কঠিন রোগের চিকিৎসায় অপারগ হলে তিনি ঔষধ বলে দিতেন। তাতে মানুষ সুস্থতা লাভ করতো। তিনি প্রতিদিন গোসলের আগে কিছু ঠাণ্ডা পানি মাথায় দিতেন, বলতেন- সারা শরীরে পানি দেওয়ার আগে মাথা ঠাণ্ডা করে নিলে বহুসংখ্যক রোগ থেকে বাঁচা যায়। তিনি আরও বলতেন, চোখের সুস্থতার জন্য ঠাণ্ডা পানি চোখে দেওয়া বা ঠাণ্ডা পানি দ্বারা উযূ করলে চোখ ভালো থাকে, দৃষ্টি শক্তিও বৃদ্ধি পায়।

অধ্যায় : আট

সফর

মানুষকে হিদায়াত ও আলোর সন্ধান দিতে ওলী-আল্লাহগণ এক জায়গায় বসে না থেকে বা তাঁদের খিদমতকে কোনো বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ না রেখে সর্বত্র বিস্তৃত বা ছড়িয়ে দিতে পছন্দ করেন। জৌনপুরী সিলসিলার বুযুর্গদের এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.), সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.), কেরামত আলী জৌনপুরী (র.), হাফিজ আহমদ জৌনপুরী (র.) প্রমুখ ওলীদের গোটা উপমহাদেশ জুড়ে খিদমতের নানা প্রক্রিয়ার কথা আজও সর্বজন বিদিত। তাঁরা ইলমে দ্বীন প্রচার, কুরআনের খিদমত, তরীকত শিক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ, ইসলামী জাগরণ এবং সর্বোপরি মানুষকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় পুরোপুরি উদ্বুদ্ধ করার জন্য হিদায়াতের লক্ষ্যে স্থানে স্থানে সফর কর্মসূচি পালন করে গেছেন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে। হযরত কেরামত আলী জৌনপুরী (র.) এবং তাঁর খলীফা ও সন্তান হযরত হাফিজ আহমদ জৌনপুরী (র.) নিজ খরচে সফরের সময় নৌকা বা বোটে ছাত্র-শিক্ষক আলিম উলামাদের সঙ্গে রেখে কুরআন-হাদীসের শিক্ষা দিতেন। বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে সেখানকার লোকদের ইসলামের পথে দাওয়াত এবং ইসলামী জীবন বিধান শিক্ষা দিতেন। এমনিভাবে তাঁরা দ্বীন প্রচারে নিজেদের উৎসর্গ করে গেছেন। জীবনের শেষ দিনটিও অতিবাহিত হয়েছে তাঁদের সফরেই। যেখানে ইন্তিকাল করেছেন সেখানেই তাঁদের সমাহিত করা হয়েছে। হযরত মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (র.) নিজ হাতে লিখে কুরআন শরীফের কপি মানুষকে বিনামূল্যে বিতরণ করতেন। তিনি যে কলমের দ্বারা কুরআন শরীফের কপি তৈরি করতেন সেই কলমের প্রতি খুব আগ্রহী ছিলেন, কুলাউড়া মনসুর নিবাসী হযরত মাওলানা নছিব উদ্দীন ছাহেব। একরাতে স্বপ্নে দেখেন, কেরামত আলী জৌনপুরী (র.) তাঁকে বলছেন, এই কলমে তোমার খুব আগ্রহ, তাই এটি নিয়ে যাও; বলে তাঁর হাতে কলমটি দিলেন। ঘুম থেকে জেগে নছিব উদ্দীন ছাহেব (র.) সেই কলমটি হাতে পেয়েছিলেন। এখনো এটি তাঁর পরিবারে সংরক্ষিত রয়েছে। তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত এই শিক্ষাই রপ্ত করেছিলেন হযরত বদরপুরী (র.)।

তিনি শিক্ষা ও শিক্ষকতা জীবনের পর থেকে ইন্তিকালের অনুমান দশ বছর পর পর্যন্ত বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট জেলা ও আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে

পায়ে হেঁটে, নৌকায় বা পালকীতে চড়ে সফর করেছেন। বলতে গেলে জীবনের পয়ষট্টি বছরকাল তিনি সফর করেছেন বিভিন্ন এলাকায়। স্থানীয় সহযোগিতা নিয়ে অনেক মসজিদ, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। মাদরাসা-মক্তব প্রতিষ্ঠা করেই তিনি ক্লান্ত হননি; বছরে নিয়মিত অন্ততঃ এক দু'বার গিয়ে দেখাশোনা করতেন এবং কোনো সমস্যা থাকলে তার সমাধান করে আসতেন। মাদরাসার বার্ষিক সভায় যোগদান ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের দাওয়াতে বদরপুরী (র.) সফরে বের হতেন। ওয়াজ-নসীহত করতেন। মানুষের দুঃখ-বেদনার কথা শুনে দুআ তাবিজ দিতেন। মানুষ দলে দলে তাঁর হাতে বায়আত হয়ে তরীকতের ফয়েয হাসিল করতো। ইসলামের সার্বিক কল্যাণে যেখানেই প্রয়োজন গিয়েছেন তা যতো কষ্টেরই হোক। উল্লেখ্য, বৃদ্ধ বয়সে তিনি বেশিরভাগ সময় পালকীতে চড়েই সফর করতেন।

বায়আত গ্রহণ

আল্লাহর ওলীগণ সার্বিক সৎগুণাবলির অধিকারী হয়ে থাকেন। এমনি এক গুণ উদারতা বা উদারমনের অধিকারী হওয়া। পথহারা মানুষ খুঁজে পাক সঠিক পথের সন্ধান, লাভ করুক আল্লাহর করুণা, এটাই তাঁর ইচ্ছা। এই মমত্ববোধ হযরত বদরপুরী (র.) এর মধ্যে ছিলো প্রবল। তাই কোনো লোক তাঁর নিকট বায়আত বা মুরীদ হতে চাইলে তিনি বিমুখ করতেন না। অর্থাৎ বায়আত গ্রহণে তিনি বাছ-বিচার করতেন না। তিনি বলতেন, মানুষকে বিগত কর্মের জন্য আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে না দিয়ে খালিছ তাওবাহর মাধ্যমে হিদায়াতের পথ দেখানো উত্তম। যদি আসতো ব্যক্তিকে আমি ফিরিয়ে দেই আর সংশোধনীর আগেই সে মারা যায় তাহলে তার হিদায়াত না হওয়ার জন্য আমি দায়ী হবো। এজন্য প্রথমে তাওবাহ এবং তারপর সংশোধন।

বায়আত গ্রহণের পর তিনি মুরীদদের প্রতি নসীহত, তা'লীম-তরবিয়াত, দুআ-দরূদ ও ওযীফা বলে দিতেন। এক্ষেত্রে সকলকেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায সুন্দর করে একাগ্র মনে আদায় করতে নির্দেশ দিতেন। তিনি বলতেন, নামাযের মাধ্যমেই আল্লাহর নৈকট্য। নামায যত আন্তরিকতার সাথে হবে জীবনও হবে ততো সুন্দর ও সফল। এছাড়া তরীকতের সবক দান, নসীহত, তাসবীহ, যিকির, দরূদ ও ওযীফা ইত্যাদির আমলের নির্দেশে আলিম ও সাধারণ বা স্থান, কাল, পাত্রভেদে বিভিন্ন সময় কিছুটা তারতম্য করতেন। অশিক্ষিত সর্বসাধারণকে সহজসাধ্য সবক দান এবং আলিমদের মধ্যেও বিবেকের তারতম্য অনুযায়ী সবক বা তাসবীহ-ইস্তেগফার এর সংখ্যা নির্ধারণ করে দিতেন। তিনি সাধারণতঃ দৈনিক দুইশত বার দরূদ শরীফ পড়ার হুকুম দিয়ে থাকতেন। তবে কখনো তা চারশত পরিমাণেও বৃদ্ধি করতেন।

শেষ জীবনে তাওবাহ্ করানো

হযরত বদরপুরী (র.) শেষ বয়সে কয়েক বছর বায়আত গ্রহণ বা মুরীদ খুব কমই করতেন। কোনো খলীফার নিকট বায়আত হতে বলে দিতেন। কিন্তু সময় সময় তাওবাহ্ করার জন্য লোকজন তাঁর নিকট গেলে তিনি অন্তিম সময় পর্যন্ত তাওবাহ্ না করায়ে পারেননি। শতঊর্ধ্ব বয়সে যখন তিনি তাওবাহ্ করাতেন, তখন নিয়মের চেয়ে সময় বেশি লাগতো। এটা তাঁর শারীরিক দুর্বলতার কারণেই নয়; বরং এ সময় তিনি মকবুলিয়াত ও কামালিয়াতের শীর্ষে অবস্থানের ফলেই এরূপ হয়ে থাকতো। অন্তিমকালে 'তাওবাহ' করানোর সময় ইস্তেগফার খুব বেশি করে পড়তেন এবং অঝোর ধারায় কাঁদতেন। কখনো কাপড়ে ধরে 'আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি জামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি' বার কতেক পড়তেন এবং এক সময় জবান বন্ধ করে দিয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়তেন। এ সময় তাঁকে তাওবার কথা স্মরণ করে দিলে স্বাভাবিক হতেন এবং সংক্ষিপ্ত মোনাজাত করে আবার ধ্যানমগ্ন হয়ে যেতেন।

শেষ জীবন

জীবন সায়াহ্নে হযরত বদরপুরী (র.) অনুমান আট বছর যাবত দৃষ্টি শক্তিহীন অবস্থায় ছিলেন। শারীরিক দিক থেকেও অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তবুও যখন তিনি কথা বলতেন বা একটু চলাফেরা করতেন তখন তাকে দেখে মনে হতোনা যে, তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। আল্লাহর ওলীদের বাহ্যিক দৃষ্টিশক্তির চেয়ে দিব্যদৃষ্টি অধিক প্রখর হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় তিনি বেশির ভাগ সময় ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতেন। প্রতিনিয়ত মাহবুবে খোদার দীদার দর্শনে ধন্য হতেন। দূর-দূরান্ত থেকে শত শত লোক তার সাথে দেখা করতে ভীড় জমাতেন। তিনি সকলের কথা শুনতেন এবং দুআ করে বিদায় দিতেন। বেশি কথা কেউ বলতে গেলে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। সাক্ষাৎপ্রার্থীদের অনেক সময় প্রশ্ন করতেন, আপনি কি চান বলুন? উত্তরে যে যা বলতো তার জন্য দুআ করে বিদায় দিতেন। এতেই সকলের হাজত-মকসুদ পুরা হত এবং সকলই খুশি হতেন।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, প্রায় প্রতিদিনই দূর-দূরান্ত থেকে পাগলদের নিয়ে আসা হতো তাঁর খিদমতে। এদের মধ্যে বেশিরভাগ লঙ্গর বা লোহার বেড়ী পরিয়ে আনা হতো। তাদেরকে বাড়ির বাহিরে বেধে রাখা হতো। কিন্তু তিনি নিজের

কামরায় বসে তাদের উদ্দেশ্যে একটা ফুঁক দিয়ে বাঁধন ছেড়ে দিতে বলতেন। তখনই দেখা যেতো, পাগল লোকটি ভালো হয়ে গিয়ে সম্বিত ফিরে পেতো এবং তাঁর সামনে গিয়ে সালাম জানাতে আগ্রহ প্রকাশ করতো।

এ সময় তিনি খুব কমই মুরীদ করতেন। কেউ মুরীদ হতে বা বায়আত হতে আরয করলে তিনি বলতেন, দেখে শুনে অন্য কারো নিকট মুরীদ হয়ে যেতে। অনেক সময় নাম উল্লেখ করে বলে দিতেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁর জামাতা ও খলীফা হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর নিকট বায়আত হয়ে নিতে বলতেন। তাঁর অনেক খলীফাকেও ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর নিকট হতে তরীকতের বিষয়াবলি জেনে নিতে এবং দুআ নিতে নির্দেশ দিতেন। বিশেষ করে চিশতিয়া তরীকার সবক গ্রহণের জন্য সকল মুরীদ ও খলীফাদের ফুলতলী ছাহেবের নিকট থেকে নিতে বলতেন। এমন অসংখ্য লোকের সাথে আমাদের আলাপ হয়েছে যারা বদরপুরী ছাহেব কিবলাহর নিকট বায়আত হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বায়আত গ্রহণ না করে ফুলতলীতে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাঁর নির্দেশক্রমে ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর নিকট তারা বায়আত হয়েছিলেন।

ইন্তিকাল ও জানাযা

মৃত্যু মানুষের জন্য বেদনাদায়ক ও কষ্টকর তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও মৃত্যুর এই স্বাদ সকল প্রাণীকেই গ্রহণ করতে হয়। দুনিয়ার জীবনকে যারা চরম পাওয়া মনে করে তাদের জন্য মৃত্যু সত্যিই ভীতিকর ও বেদনাদায়ক। আবার যারা দুনিয়ার সফরকে ক্ষণস্থায়ী মনে করে থাকেন এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে সক্ষম হন তাদের নিকট মৃত্যু বেদনা নয়; বরং আনন্দের হয়ে দেখা দেয়। এরপরও মৃত্যুর সংকট মুহূর্তে দুনিয়ার প্রতি সকলেরই কিছুটা মোহ-মায়া জেগে থাকে।

আল্লাহর ওলী, প্রিয় বান্দাগণের কাজ-কর্ম, জীবন-মৃত্যু সবই মাওলার প্রতি সমর্পিত থাকে, তাই মৃত্যু তাদের নিকট কোনো অভাবনীয় বিষয় নয়। তারা প্রতিনিয়ত দয়াময়ের সান্নিধ্য লাভে ব্যাকুল হয়ে থাকেন। এরাই মূলত সফলকাম।

পীরানে পীর, হাদিয়ে যামান, কুত্বুল আউলিয়া হযরত বদরপুরী (র.) এর ইন্তিকাল তাঁর নিকট অভাবনীয় না হলেও আমাদের মতো লক্ষ লক্ষ ভক্তের কাছে বেদনাদায়কই নয়; ছিলো হৃদয় বিদারক ঘটনাও। তিনি একশত পাঁচ বছরের সুদীর্ঘ হায়াত লাভ করেও অতৃপ্তির মধ্যেই যেন ফেলে গেলেন সকলকে। তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি ব্যয় করেছেন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির পথে। কোনো না কোনোভাবে মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা করাই

তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত ছিলো। প্রথম চল্লিশ বছর শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানের ব্যস্ততার ফাঁকে ব্যক্তিগত দায়িত্ব বটেই; পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে সক্রিয় ও সফল ভূমিকা পালন করেন। বাকী পয়ষট্টি বছর এগুলোর পাশাপাশি তিনি একান্তভাবেই দ্বীনি খিদমত বা হিদায়াত ও তাবলীগে দ্বীন এবং তরীকতের মহান দায়িত্ব আঞ্জামে ব্যস্ত রাখেন নিজেকে। কিন্তু সকল কাজ-কর্মের যেমন একটা শেষ রয়েছে, তেমনি জীবনেরও রয়েছে একটা পরিসমাপ্তি। হযরত বদরপুরী (র.) এরও কর্মময় বা সফলময় জীবনের পরিসমাপ্তি লগ্নে শারীরিক দুর্বলতা ও বার্ধক্য তাঁকে পরপারে দয়াময়ের একান্ত সান্নিধ্য লাভের সংকেত চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দিল এক সময়।

দিনটি ছিলো ১৩৭৭ হিজরীর জমাদিউস সানী মাসের ২৯ তারিখ, ১৯৫৮ ইংরেজির ১৯ জানুয়ারি, বাংলা ১৩৬৩ সনের ৬ মাঘ সোমবার। বিকাল বেলা তাঁর শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। ভেতর বাড়ির নিজ কামরায় বিবি সাহেবা, ছাহেবজাদাগণ ও নিকট আত্মীয়জন পরিবেষ্টিত ছাহেব কিবলাহ ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বাক-নিস্তেজ।

বড় ছাহেবজাদা কয়েকবার 'আল্লাহ' বলে তালকীন দিলেন, কিন্তু কোনো উত্তর না পেয়ে দাড়িয়ে রইলেন। কথা বলার শক্তি নেই, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো নাড়াবার শক্তিও তাঁর নেই। এমতাবস্থায় হঠাৎ চোখ মেলে ঘরের ছাদের দিকে তাকালেন এবং মুচকি হাসিতে একখানা হাত সজোরে চাদরের ভেতর থেকে টেনে বের করে ছাদের দিকে মনে হলো কাউকে ইশারা করলেন। আর সাথে সাথে উচ্চস্বরে ডাকতে লাগলেন পরওয়ার দিগারের মহিমান্বিত নাম ধরে- 'আল্লাহু, আল্লাহু।' একশত গজেরও বেশি দূরবর্তী বাড়ির বাহির আঙ্গিনা থেকে তা স্পষ্ট শোনা গেলো। সুকরুণ স্বরে এই 'আল্লাহু' ধ্বনি মনে হলো আকাশ-বাতাস ছেদ করে আরশে আযীমে গিয়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। আর একই সাথে সন্ধ্যা ৫.১৬ মিনিটের সময় পরিবার-পরিজন ও লক্ষ লক্ষ মুরীদ আর ভক্তের অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেছনে রেখে দয়াময়ের করুনার পাত্র হিসেবে বাংলা ও আসামের হাদী, হিদায়াতের দ্বীপ্ত আলোক শিখা হযরত মাওলানা আবূ ইউসুফ শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ছাহেব কিবলাহ বদরপুরী (র.) এর অন্তিম আকুলতা মাখা 'আল্লাহু' ধ্বনি সেদিন এই চরাচরে যে সুর ছড়িয়ে দিয়েছিলো তা আজও গভীর নিশীথে ভক্ত-আশিকজনের হৃদয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। দীর্ঘ সংসারের সবচেয়ে

অর্থময়, সবচেয়ে মধুর-সুন্দর, সবচেয়ে প্রিয়-আরদ্ধ এই মহিমাময় ধ্বনি। তাঁর সুযোগ্য উত্তরসুরীদের মাধ্যমে শেষ দিন পর্যন্ত সততঃ জারি রাখবেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন!

দাফন ও কবর

১৯৫৮ ইংরেজি সনের ১৯ জানুয়ারি, সোমবার বিকাল ৫.১৬ মিনিটে হযরত বদরপুরী (র.) ইন্তিকাল করেন। এই খবর অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল গোঠা বরাক উপত্যকায়। সন্ধ্যা নেমে এলো, লোকে লোকারণ্য হতে লাগলো বদরপুর। রাত যতো বৃদ্ধি পেল লোক সমাগম ততো বাড়তে লাগলো। হাজার হাজার ভক্তের সুকরুন ফরিয়াদ অন্ধকারে একের পর এক হারিয়ে যেতে লাগলো। দয়াময়ের অশেষ করুনা তাঁর প্রিয়বান্দা 'ইয়াকুব'এর প্রতি ঝরতে লাগলো। এভাবে কাউকে বুঝতে না দিয়েই ভোরের আভা ফুঠে উঠলো। পূর্বাকাশে মুয়ায্যিনের কণ্ঠে উচ্চারিত হলো ফজরের আযান। ভোর হওয়ার সাথে সাথে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে এল লোকজন। পরদিন ১২ টায় তাঁকে গোসল করানো হলো, বড় ছাহেবজাদা হযরত মাওলানা মাহমুদুর রহমান ছাহেব, মাওলানা সাতির আলী গদিশপুরী ছাহেব (র.) প্রমুখ তাঁকে গোসল দিতে লাগলেন। এক পর্যায়ে মৃতদেহের সীনা বা বুকে প্রচণ্ড রকমের গরম অনুভব করলেন তাঁরা। বিস্ময়ে হতভম্ব না হয়ে উপায় নেই, কারণ প্রায় বিশ ঘন্টা আগের মৃতদেহে শতাধিক ডিগ্রির জ্বর কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়। হতবিহ্বল চিত্তে তারা ভালোভাবে পরখ করে দেখলেন, গরম তাঁর কলবের দিক থেকে বের হচ্ছে। সহসা সকলের মনে পড়ল ছাহেব প্রায়ই একটা ঘটনার কথা বলতেন। যখন তার মুর্শিদ হযরত হাফিজ আহমদ জৌনপুরী (র.) থেকে খিলাফত লাভ করেছিলেন, তখন মুর্শিদ তাঁর কলবের উপর স্বজোরে বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়ে চাপ দিয়ে বলেছিলেন, আপনার সাথে আর কোনো দিন দেখা হবে না, আর এর প্রয়োজনও হবেনা। যা দরকার সবই হয়ে গেছে। সেদিনের পর থেকে তাঁর কখনো ঠাণ্ডা হয়নি। আজ দীর্ঘ কয়েক যুগ পরে মৃত্যুকালে সারা শরীর ঠাণ্ডা নিস্তেজ হয়ে গেলেও জৌনপুরী (র.) এর বৃদ্ধাঙ্গুলীর স্পর্শ কোনোভাবেই স্তিমিত হয়নি। ইন্তিকালের পরের দিন মঙ্গলবার গোসল শেষে কাফন পরিয়ে বাড়ির পাশ্ববর্তী মাঠে জানাযার নামাযের ব্যবস্থা করা হলো। জানাযার নামাযে বড় ছাহেবজাদা ইমামতি করলেন। শরীক হওয়া লোকজনদের মধ্যে সমকালীন বুযুর্গানে কিরাম, উলামা-মাশায়িখ, খলীফাগণ, আত্মীয়-স্বজন, মাদরাসা, স্কুল, কলেজের ছাত্র-শিক্ষকগণসহ সর্বস্তরের ভক্ত আশিকগণ দিল-মন উজাড় করা ভালোবাসা দিয়ে দুআর মাধ্যমে শেষ বিদায় জানালো। পীরানে পীর, কুতবুল আউলিয়া, হাদিয়ে যামান হযরত মাওলানা আবূ ইউসুফ শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী (র.) কে।

বাড়ির সামনে মসজিদ। মসজিদের সামনে রয়েছে পুকুর। পুকুরের দক্ষিণ পাশ ঘেষে তাঁকে কবর দেয়া হয়েছে। কবরের জন্য এ জায়গা আগেই ওয়াকফ করে রাখা ছিলো। ছাহেবের খলীফা তৈকামালের হাফিজ মুজাম্মিল আলী ছাহেব স্বপ্নে দেখে এই জায়গা কবরের জন্য ওয়াকফ করে রেখেছিলেন। মাযার শরীফের পূর্ব দেয়াল ঘেষে বিবি সাহেবানীর কবর রয়েছে। পশ্চিম দিকের খালি জায়গা ও মাযার শরীফ নিয়ে বর্তমানে হিফজ মাদরাসা ও যিয়ারতকারীদের বসার স্থান পাকা করে বানানো হয়েছে। সে সময়ে লন্ডন প্রবাসী হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর মুরীদগণের অনেকেই এই কাজে সহযোগিতা করেছেন। গদ্দিনশীন বড় ছাহেবজাদা হযরত মাওলানা মাহমুদুর রহমান ছাহেব এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে এ কাজটি করা হয়েছে।

বদরপুরী (র.) এর স্মরণ

মৃত্যুর পর জাগতিক সকল কাজ কর্মের সাথে সাথে মানুষের আমলের পথও বন্ধ হয়ে যায় চিরতরে। দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকতে যতটুকু সম্ভব তার ওপর নির্ভর করেই পরকালের কঠিন যাত্রা। কিন্তু এটাই চূড়ান্ত কথা নয়; মানুষ তাঁর উত্তম কর্ম ও সুযোগ্য স্থলাভিষিক্ত দ্বারা পরকালে লাভবান হওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা করে রেখেছেন দয়াময় আল্লাহ তাআলা। ইহা মানব জাতি বিশেষ করে উম্মতে মুহাম্মদী (সা.) এর প্রতি আল্লাহর অপার করুনা। হযরত বদরপুরী (র.) ইসলামের জন্য উৎসর্গীকৃত স্বার্থক জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তিনি কেবল সফলতাই লাভ করেননি, পেরেছিলেন যোগ্য উত্তরাধিকার রেখে যেতেও। নিজ সন্তানদের সুশিক্ষা দান, স্থানে স্থানে মাদরাসা-মক্তব কায়িম, তরীকতের খিলাফত প্রদান, দান-খয়রাতে মানুষকে উৎসাহ দান ইত্যাদি ধর্মীয়, সামাজিক যাবতীয় খিদমতে কৃতিত্বের দাবীদার এই যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ এর চিরদিন অমর হয়ে থাকার ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছিলো তাঁর জীবদ্দশায়। বলাবাহুল্য, এসবই একই সূত্রে গাঁথা ছিলো। আর এসবের মূলে তরীকতের মহান খিদমতই ছিলো উল্লেখযোগ্য। তরীকতের খিদমত অব্যাহত রাখতে তিনি রেখে গেছেন যোগ্য সন্তান ও স্থলাভিষিক্ত। তাঁর হাতেগড়া এসকল খলীফাদের দ্বারা আবাদ হচ্ছে দুনিয়া, হচ্ছে ভৌগলিক সীমারেখা পেরিয়ে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তও। শুধু কি আল্লাহর যিকিরের আবাদ! এরই সাথে কায়িম হচ্ছে দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাদরাসা, মক্তব,

এতিমখানা, লঙ্গরখানা আর মানব সেবার অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। তারা বিশ্বব্যাপি কায়িম করেছেন কুরআনুল কারীমের সহীহ শুদ্ধ পাঠ-পঠন। সেই সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা বিশ্বাসে ও আল্লাহ-রাসূল প্রেমে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে হযরত বদরপুরী (র.) এর রেখে যাওয়া খিদমতসমূহে প্রতিনিয়ত স্মরণ করা হচ্ছে তাঁকে। এছাড়া বড় ছাহেবজাদা গদ্দীনশীন হযরত মাওলানা মাহমুদুর রহমান ছাহেবসহ ভারতে অবস্থানরত বদরপুরী ছাহেবের অসংখ্য খ্যাতনামা আলিম মুরীদানদের দ্বারাও তাঁর স্মরণ জারি রয়েছে। বড় ছাহেবজাদার নেতৃত্বে আসাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত সুন্নি জামাআতের আকিদা-বিশ্বাসে মানুষকে উদ্বুদ্ধ রাখতে দৃঢ়তার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা, মসজিদ, মক্তব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহ আজও তাঁর স্মৃতি বহন করে চলেছে।

বাংলাদেশে হযরত বরপুরী (র.) এর ভক্ত মুরীদানদের সংখ্যা কোনো অংশে ভারত থেকে কম ছিলোনা। তাঁর ইন্তিকালের পর এই ধারা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে দেশে-বিদেশে প্রসারতা লাভ করেছে। তাঁর প্রিয় খলীফা ও জামাতা মুজাদ্দিদে যামান হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর দ্বারা। বদরপুরী (র.) এর রেখে যাওয়া আমানতের যথাযথ মূল্যায়ন হয়েছে ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর দ্বারা। মুর্শিদ কিবলাহর দুআ ও ভালোবাসা পূর্ণমাত্রায় ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ লাভ করতে পেরেছিলেন বলে তরীকতের ব্যাপকতা তাঁর হাতেই হয়েছে। তার মাধ্যমে এই ব্যাপকতা লাভের ইঙ্গিত বদরপুরী (র.) জীবদ্দশায় দিয়ে গেছেন। সেই ইঙ্গিতের সূত্র ধরে ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ আজ বিশ্বব্যাপি এক সুপরিচিত ও সফল ব্যক্তিত্ব। লক্ষ লক্ষ ভক্ত মুরীদানের নিকট কেবল তিনি পরিচিতই নন; তাঁর সূত্র ধরে বদরপুরী (র.) এর পরিচিতিও সর্বত্র রয়েছে। কুরআনে পাকের বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের প্রতিষ্ঠান 'দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট' এর কার্যক্রম দেশে-বিদেশে ব্যাপকতা লাভের পাশাপাশি হযরত বদরপুরী (র.) এর ইয়াদগারী জারি রয়েছে।

হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) দেশে-বিদেশে অনেক মাদরাসা, মক্তব প্রতিষ্ঠিত করেছেন অথবা তাঁর মুরীদদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা তাঁর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। এগুলোর বহুসংখ্যক মাদরাসা তাঁর নামে নামকরণ করা হলেও তিনি তাঁর মুর্শিদ বদরপুরী (র.) এর নামে তা পরিবর্তন করেন। 'ইয়াকুবিয়া' নামের মাদরাসাগুলোর মধ্যে সিলেট শহরের কেন্দ্রস্থল সুবহানীঘাটে হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠানের নামকরণ ছাড়াও হযরত ফুলতলী ছাহেব

কিবলাহ (র.) তাঁর মুর্শিদের স্মৃতিকে অমর করে রাখতে নিজের রচিত বারো চাঁদের খুতবাহ এর নামকরণ করেছেন, "আল-খুতবাতুল ইয়াকুরিয়া।" তাছাড়া, বদরপুরের উপর দিয়ে যাওয়া মহাসড়ক থেকে ছাহেব বাড়ি তথা বুন্দাশীল গ্রাম পর্যন্ত রাস্তাটি তাঁর নামে "শাহ ইয়াকুব সড়ক" নামকরণ করা হয়েছে।

ঈসালে সাওয়াব

হযরত বদরপুরী (র.) এর জীবদ্দশায় বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে তাঁর খলীফাগণের দ্বারা কেবল ভারত উপমহাদেশেই নয়; বিশ্বের বহু স্থানে বিশেষ করে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের নিকট তিনি সুপরিচিতই নন; ওলীয়ে কামিল হিসেবেও ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয়। যে কারণে দেশ বিদেশের বহু স্থানে আড়ম্বর কিংবা অনাড়ম্বরভাবে চলে আসছে তাঁর ঈসালে সাওয়াব বা স্মরণ মাহফিল। আর এগুলো বেশির ভাগই অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাঁর জামাতা ও খলীফা হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর তত্ত্বাবধানে। ভারতে বদরপুরী (র.) এর মাযার সংলগ্ন মাঠে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তাঁর ফাতেহা মাহফিল। গদ্দিনশীন বড় ছাহেবজাদা হযরত মাওলানা মাহমুদুর রহমান ছাহেবের তত্ত্বাবধানে সেখানে আসাম-ত্রিপুরা অঞ্চলের ভক্ত-মুরীদানের সমাগম যথেষ্ট পরিমাণ হয়ে থাকে। যথা সম্ভব ফুলতলী ছাহেব কিবলাহও এতে তাশরীফ নিয়ে থাকেন। এক সময় বাংলাদেশ থেকেও বহুসংখ্যক লোকজন এই মাহফিলে শরীক হতেন। বর্তমানে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশী ভক্তবৃন্দ বদরপুরের ফাতেহা মাহফিলে অংশ নেওয়া অনেকাংশে সম্ভব হয়ে উঠেনি। তাই বাংলাদেশেও প্রতিবছর বদরপুরী (র.) এর ঈসালে সাওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। দীর্ঘদিন থেকে মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া থানা সদরে আলালপুরে বদরপুরী ছাহেব কিবলাহর খলীফা হাফিজ আপ্তাব খান (র.) এর মাযার ও বাড়ি সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে দেশের বৃহত্তম ঈসালে সাওয়াব মাহফিল। হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এই মাহফিলের সরাসরি তত্ত্বাবধান করে থাকেন। প্রতিবছর শীত মওসুমে এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এই ঈসালে সাওয়াব মাহফিলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর লক্ষ্যাধিক ভক্ত মুরীদান অংশ নিয়ে থাকেন। সকাল থেকে পরদিন ফজর পর্যন্ত বদরপুরী (র.) এর জীবন-

কর্ম নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও মিলাদ মাহফিল, খতমে কুরআন, খতমে খাজেগান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সর্বস্তরের ভক্ত আশিকান তাদের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও চোখের পানি দিয়ে পীরানে পীর হযরত বদরপুরী (র.) এর রূহে সাওয়াব রেছানী করে থাকেন।

অধ্যায় : নয়

তরীকা ও সিলসিলা পরিচিতি

ইলমে তাসাউফে খ্যাতনামা বুযুর্গদের নিয়ম পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তরীকা। তাসাউফ জগতে বহু তরীকার নাম শোনা যায়। ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত তরীকাগুলো হলো,

১. পীরানে পীর বড়পীর সৈয়দ আবদুল কাদির জিলানী (র.) থেকে কাদেরিয়া তরীকা।

২. খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি আজমিরী (র.) হতে 'চিশতিয়া তরীকা'।

৩. হযরত বাহাউদ্দীন নক্শবন্দী (র.) থেকে 'নক্শবন্দীয়া তরীকা'।

৪. মুজাদ্দিদে আলফে সানী সেরহিন্দী (র.) থেকে 'মুজাদ্দেদিয়া তরীকা'।

৫. ইমামুত তরীকত হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) থেকে 'তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া'। এই তরীকা উপরোক্ত চার তরীকার পাশাপাশি একটি সমন্বিত তরীকা হিসেবে প্রচলিত রয়েছে। 'তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া' সম্পর্কে হযরত সৈয়দ আহমদ (র.) কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, অন্যান্য তরীকার মাধ্যমে মানুষ রিয়াযত-মেহনতের দ্বারা আল্লাহর কুরবত বা সান্নিধ্য লাভ করে থাকে, আর 'তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া' এর বিশেষত্ব হলো, এই তরীকার মাধ্যমে মানুষ জীবনের সমস্ত নেক কর্ম ও আমল দ্বারা আল্লাহর কুরবত লাভে ধন্য হয়। অর্থাৎ অন্যান্য তরীকায় আল্লাহর নৈকট্য লাভে বিশেষ কিছু আমলের সাহায্য নিতে হয়, আর তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া'র শিক্ষা হলো, আমার নামায-বন্দেগী, জীবন, মৃত্যু সবই আল্লাহর জন্য এই আয়াতের অনুসরণে জীবনের সামগ্রিক উত্তম সকল কাজ-কর্ম দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করা।

উল্লেখ্য, এই উপমহাদেশে যে সকল বুযুর্গদের দ্বারা ইলমে মা'রিফত বা তাসাউফ চর্চা আবাদ বা জারি রয়েছে তারা স্বীয় মুর্শিদ থেকে উপরোক্ত

কোনো না কোনো একটি বা একাধিক তরীকার সবক বা তা'লীম ও ফয়েয লাভ করে সর্বসাধারণে প্রচার করে আসছেন। এই তরীকা সমূহের তা'লীম বা অনুশীলনে স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আউলিয়াগণ খিলাফত লাভের সময় মুর্শিদ থেকে যে যে তরীকার সনদ ও ইজাযত লাভ করেন, সে অনুযায়ী মুরীদগণকে সবক প্রদান করে থাকেন। জৌনপুরী সিলসিলার বুযুর্গদের উপরোক্ত পাঁচ তরীকার ইজাযত ছিলো। যে জন্যে বদরপুরী (র.) তাঁর মুর্শিদ হযরত হাফিজ আহমদ জৌনপুরী (র.) থেকে এই পাঁচ তরীকারই সনদ ও ফায়েয লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর মুরীদানদের চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নক্‌শবন্দীয়া, মুজাদ্দেদীয়া ও মুহাম্মদীয়া তরীকার উপর বায়আত গ্রহণ ও সবক দান করতেন। কাউকে আবার কোনো এক তরীকারও সবক দান করতেন। এ সকল তরীকাসমূহের সনদের ধারাবাহিকতা হুযুর (সা.) থেকে সুনির্দিষ্ট মাধ্যম পরম্পরায় গাথা রয়েছে। নিম্নে বদরপুরী (র.) এর পাঁচ তরীকার সনদের ধারাবাহিক তালিকা দেওয়া হলো-

তরীকায়ে চিশতিয়া ও মুহাম্মদীয়া

১। কুতবুল-আউলিয়া হযরত **মাওলানা আবূ ইউসুফ শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব কিবলাহ** বদরপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২। কুদ্‌ওয়াতুল উলামা ওয়াল-উরাফা **হযরত মাওলানা হাফিজ আহমদ সিদ্দীকী** জৌনপুরী কুদ্দিছা ছিররুহুল-আযীয।

৩। তাঁর সম্মানিত পিতা কুদ্‌ওয়াতুল উলামা যুব্‌দাতুল মুহাদ্দিসীন ওয়াল মুফাস্‌সিরীন মাওলানা ওয়া মুর্শিদুনা **হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৪। যুব্‌দাতুল আরিফীন, কুদওয়াতুছ-ছালিকীন আমীরুল মুমিনীন মাওলানা ওয়া মুর্শিদুনা **হযরত মাওলানা সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

[তিনি দুইভাবে সিলসিলাহসমূহের ফুয়ূযাত ও বারাকাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। প্রথমতঃ তিনি ইমামুত-তরীকত ও শরীআত হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে রূহানীভাবে ওয়াইছিয়াহ ছাভিয়্যাহ তরীকায়ে নকশবন্দিয়াহর সরাসরি ফয়েয ও খিলাফতপ্রাপ্ত।

কুত্‌বুল-আকতাব হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে রূহানীভাবে চিশতিয়া তরীকাহর খিলাফত পেয়েছেন।

হযরত গাওছুছ-ছাকালাইন সায়্যিদ আবদুল কাদির জীলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে রূহানীভাবে কাদিরিয়াহ তরীকাহর খিলাফত লাভ করেন।

কোনো মাধ্যম ব্যতিতই তরীকায়ে মুজাদ্দিদিয়াহ ও মুহাম্মদিয়াহর সরাসরি ফয়েয ও বরকত লাভ করেছেন মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহু থেকে।

বিনা মাধ্যমে সরাসরি ওয়াইছিয়াহ তরীকাহর ফয়েয ও বরকত লাভ যদিও আল্লাহ তাআলা গাফুরুর রাহীমের অপার দয়ায় হয়েছে, তথাপি এখানে তাঁর মুর্শিদে বরহকের দুআ কার্যকরী ছিলো।

এ মাহাত্ম্য অর্জনের দ্বিতীয় মাধ্যম হলো মুর্শিদে মুকাম্মিলের নিকট বায়আত করা ও তাঁর খিলাফত ও ইযাযত প্রাপ্তির মাধ্যমে।]

৫। কুদওয়াতুল উলামা ওয়াল মুহাদ্দিসীন ওয়ারিছুল আম্বিয়া ওয়াল-মুরছালীন হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন মাওলানা ও মুর্শিদুনা হযরত শাইখ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৬। তাঁর সম্মানিত পিতা রঈছুল মুহাদ্দিসীন ওয়াল মুফাস্‌সিরীন **হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৭। তাঁর সম্মানিত পিতা **হযরত শাইখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম** মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৮। তাঁর নানাজান **শাইখ রফীউদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি** থেকে চিশতিয়া তরীকাহর খিলাফত প্রাপ্ত।

৯। **শাইখ কুতবুল আলম** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১০। **শাইখ নজমুল হক** (চায়েঁ লুদ্দাহ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১১। **শাইখ আবদুল আযীয** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১২। **কাযী খান ইউছুফ নাছেহী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৩। **শাইখ হাসান তাহির** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৪। **শাইখ সায়্যিদ রাজী হামিদ শাহ** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৫। **শাইখ হুছামুদ্দীন মানিকপুরী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৬। **খাজা নূরুদ্দীন নূর কুতবুল আলম** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৭। **শাইখ আলাউদ্দীন আলাউল হক** লাহোরী বাংগালী (র.)।

১৮। **শাইখ সিরাজুদ্দীন উসমান আখী সিরাজ** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৯। সুলতানুল আউলিয়া মাহবুবে ইলাহী **হযরত নিযামুদ্দীন** (র.)।

২০। ইমামুয যাহিদীন **হযরত শাইখ ফরীদুদ্দীন গনজে শকর** (র.)।

২১। **হযরত খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২২। নায়েবে রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন আহমদ হাসান** চিশতী ছনজুরী, আজমিরী (র.)।

২৩। **হযরত খাজা উসমান হারুনী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৪। **হাজী শরীফ যাদানী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৫। খাজা **মওদুদ চিশতী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৬। খাজা **ইউসুফ চিশতী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৭। খাজা **মুহাম্মদ চিশতী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৮। খাজা **আবু আহমদ চিশতী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৯। খাজা **আবু ইসহাক শামী** চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩০। খাজা **মুমশাদ আলাভী দীনাওরী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩১। হযরত **খাজা আবু হুরাইরা বসরী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩২। হযরত **খাজা হুযাইফাহ মারআশী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩৩। সুলতানুত তারেকীন **হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম** (র.)।

৩৪। হযরত খাজা **ফুযাইল ইবনে আইয়া** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩৫। **হযরত খাজা আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যাইদ** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩৬। খাইরুত তাবেয়ীন **হযরত খাজা হাসান বসরী** (র.)।

৩৭। **ইমামুল আউলিয়া কুদওয়াতুল আতকিয়া হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু**।

৩৮। সায়্যিদুল আম্বিয়া ইমামুল মুরসালীন মাহবুবে রাব্বিল আলামীন **আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহী** ওয়া সাহবিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামা আজমায়ীন।

তরীকায়ে কাদিরিয়াহ

[হযরত আবদুর রহীম দেহলভী (র.) পর্যন্ত কাদিরিয়াহ তরীকার সিলসিলা চিশতিয়াহ ও মুহাম্মদিয়া তরীকার অনুরূপ।]

৭। **শাইখ আবদুর রহীম মুহাদ্দিসে দেহলভী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৮। **সায়্যিদ আবদুল্লাহ আকবরাবাদী (আগ্রা)** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৯। **সায়্যিদ আদম বিন্নূরী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১০। ইমামে রব্বানী মখ্দুমে যমানী মুজাদ্দিদে আলফে ছানী **শাইখ আহমদ ফারূকী সিরহিন্দী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১১। তাঁর সম্মানিত পিতা **শাইখ আবদুল আহাদ সিরহিন্দী** (র.)।

১২। **হযরত শাহ কামাল কাইথলী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৩। **হযরত শাহ ফুযাইল** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৪। **সায়্যিদ গাদা রহমান** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৫। **সায়্যিদ শামছুদ্দীন আরিফ** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৬। **সায়্যিদ গাদা রহমান ছানী ইবনে আবূল হাসান** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৭। **হযরত শাইখ শামছুদ্দীন ছাহ্রায়ী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৮। **সায়্যিদ আকীল** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৯। **সায়্যিদ বাহাউদ্দীন** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২০। **সায়্যিদ আবদুল ওয়াহ্হাব** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২১। **সায়্যিদ শারফুদ্দীন কাত্তাল** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২২। **সায়্যিদ আবদুর রায্যাক** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৩। গাওছুল আযম **সায়্যিদুনা মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির জীলানী** (র.)।

২৪। **শাইখ আবূ ছাঈদ মুখার্রূমী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৫। **শাইখ আবুল হাসান কারাশী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৬। **শাইখ আবুল ফরহ ত্বারতূছী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৭। **শাইখ আবুল ফযল আবদুল ওয়াহিদ তমীমী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৮। **শাইখ আবদুল আযীয তমীমী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৯। **শাইখ আবূ বকর শিবলী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩০। **সায়্যিদুত তায়িফাহ্ হযরত জুনাইদ বোগদাদী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩১। **শাইখ আবুল হাসান চির্রী ছাকতী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩২। **শাইখ মা'রূফে কার্খী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩৩। **হযরত ইমাম আলী রেযা** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩৪। **হযরত ইমাম মূসা কাযিম** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩৫। **হযরত ইমাম জাফর সাদিক** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩৬। হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩৭। হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন রাদ্বিআল্লাহু তাআলা আনহু।

৩৮। সায়্যিদুশ্ শুহাদা হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু তাআলা আনহু।

৩৯। সায়্যিদুল আউলিয়া খাতিমুল খুলাফা হযরত আলী মুরতাদ্বা কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু।

৪০। সায়্যিদুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম।

তরীকায়ে নক্শবন্দীয়াহ ও মুজাদ্দিদিয়াহ

[এ দুই তরীকার সিলসিলাও শাহ আবদুর রহীম দেহলভী (র.) পর্যন্ত পূর্বোক্ত তরীকাসমূহের অনুরূপ।]

৭। শাইখ আবদুর রহীম মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৮। সায়্যিদ আবদুল্লাহ আকবরাবাদী (আগ্রা) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৯। মাওলানা সায়্যিদ আদম বিন্‌নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১০। হযরত শাইখ আহমদ সিরহিন্দী ফারূকী মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১১। হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১২। খাজা আমকাংগী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৩। মাওলানা দরবেশ মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৪। মাওলানা যাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৫। খাজা উবাইদুল্লাহ্ আহরার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৬। মাওলানা ইয়াকুব চরখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৭। ইমামুশ শরীআত ওয়াত তরীকত খাজা বাহাউদ্দীন নক্শবন্দী বুখারী (র.)।

১৮। হযরত খাজা মুহাম্মদ বাবা ছাম্মাছী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

১৯। হযরত খাজা আলী রামীতানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২০। হযরত খাজা মাহমূদুল খাইর ফাগ্‌নাভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২১। হযরত খাজা আরিফ রেওগিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২২। খাজায়ে খাজেগান আবদুল খালেক গেজদাওয়ানী (র.)।

২৩। হযরত খাজা ইউসুফ হামদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৪। **হযরত খাজা আবূ আলী ফারমাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।**

২৫। ইমাম **আবুল কাছেম কুশাইরী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৬। **হযরত শাইখ আবূ আলী দাক্কাক্** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৭। **হযরত শাইখ আবুল কাছেম নাছীরাবাদী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৮। **হযরত শাইখ আবূ বকর শিবলী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২৯। সায়্যিদুত তায়িফাহ্ **হযরত জুনাইদ বোগদাদী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩০। **হযরত শাইখ আবুল হাসান ছির্রী ছাকতী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩১। **হযরত শাইখ মারূফ কার্খী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩২। **হযরত ইমাম আলী রেযা** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩৩। **হযরত ইমাম মূসা কাযিম** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩৪। **হযরত ইমাম জাফর সাদিক** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৩৫। রঈছুল ফুকাহা ওয়াত্ তাবিঈন **হযরত কাছিম ইবনে মুহাম্মদ** (র.)।

৩৬। **ছাহেবে রাসূলিল্লাহ্ হযরত সালমান ফারসী** রাদ্বিআল্লাহু তাআলা আনহু।

৩৭। আমীরুল মুমিনীন সায়্যিদুল ওয়াছিলীন আফদ্বালুল খুলাফায়ির রাশিদীন **হযরত আবূ বকর সিদ্দীক** রাদ্বিআল্লাহু তাআলা আনহু।

৩৮। সায়্যিদুল মুরছালীন ইমামুল মুত্তাকীন **আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহী** ওয়া সাহবিহী ওয়া বারাকা ওয়াসাল্লাম।

খিলাফত প্রদান

'খিলাফত' একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। গুণে-মানে, স্বভাব-চরিত্রে এবং সর্বোপরি তরীকতের শিক্ষা গ্রহণ, অনুশীলন ও আমলের পরিপূর্ণতা লাভের পর মুরীদদের মধ্যে যোগ্য ও বিশ্বস্থ কাউকে স্থলাভিষিক্ত করার নাম খিলাফত প্রদান। পূর্ববর্তী বুযুর্গদের সাথে যোগসূত্র তৈরি করে দিয়ে যাকে মুরীদ করার অনুমতি দেওয়া হয় তিনিই হন খলীফা বা প্রতিনিধি। আর এজন্য ইলমে দ্বীন সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হওয়াও জরুরী। তাই ওলী-আল্লাহগণ সাধারণত: উলামাদের মধ্য থেকে একাধিক ব্যক্তিকে খলীফা মনোনীত করে থাকেন। আলিম ছাড়াও কোনো ব্যক্তি যোগ্যতা ও মকবুলিয়াতের ভিত্তিতে মুর্শিদ থেকে খিলাফত লাভের যোগ্যতা রাখেন। এর বাইরেও মুরীদদের

কিছুসংখ্যক যারা বায়আত করার অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, তাদের মোজায বলা হয়।

হযরত বদরপুরী (র.) খিলাফত প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণত: আলিমদেরকেই মনোনীত করতেন। কারণ ইলমে শরীআত ছাড়া ইলমে মা'রিফতের সদ্ব্যবহার বা পরিপূর্ণতা অনেকাংশেই সম্ভবপর নয়। অন্ততঃ শরহে যামী পর্যন্ত পড়া আলিম বা ইলমে দ্বীনের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া খিলাফত প্রদান করতেন না। সিলেট ও কাছাড় জেলার আলিমদের মধ্যে তাঁর খলীফা তুলনামূলক বেশী। এই দুই জেলার লোকজন তাঁর সান্নিধ্য বেশী লাভ করেছিলেন বলেই মুরীদানের সংখ্যাও এই জেলাগুলোতে বেশী বলে অনুমিত হয়।

তাঁর খলীফাদের সঠিক সংখ্যা জানা সম্ভব হয়নি। প্রথম দিকে খলীফাদের তালিকা রাখা হলেও পরবর্তীতে এমন অনেককেই খিলাফতী প্রদান করেছিলেন যাদের তালিকা রাখা হয়নি। তবে যাদেরকে 'খিলাফত' প্রদান করেছেন, তাদেরকে সীলমোহর ও স্বাক্ষরসহ লিখিত সনদ প্রদান করতেন।

খলীফা পরিচিতি

হযরত বদরপুরী (র.) থেকে তরীকতের সনদপ্রাপ্ত খলীফাগণের সঠিক সংখ্যা, তাদের পূর্ণ তালিকা ও পরিচিতি সংগ্রহ করা পুরোপুরি সম্ভব হয়ে উঠেনি। যারা হযরত বদরপুরী (র.) এর স্নেহচ্ছায়ায় তরীকতের উচ্চ মাকামে পৌছে খিলাফত লাভ করেছিলেন এবং সিলসিলার বন্ধনে আবদ্ধ করে আল্লাহর নৈকট্য ও হুযুর (সা.) এর মহব্বত জাগিয়ে তুলে মানুষকে দেখিয়ে গেছেন চির কল্যাণের পথ ও পদ্ধতি। তাদের মধ্যে অন্যতম যে কয়েকজন বুযুর্গের নাম জানা সম্ভব হয়েছে, তা নিম্নে দেওয়া হলো,

১। হযরত মাওলানা মাহমুদুর রহমান ছাহেব (মাদ্দাঃ), গদ্দীনশীন বড় ছাহেবজাদা, বদরপুর, আসাম, ভারত।

২। হযরত কারী মো. মছউদ (র.), ফেলাডহর, কাছাড়, আসাম, ভারত।

৩। হযরত মৌলভী মুফাছছিল আলী (র.), মহাকল, করিমগঞ্জ, আসাম, ভারত।

৪। হযরত মাওলানা মুহসীন নিমাই চানপুরী (র.), হাইলাকান্দি, আসাম, ভারত।

৫। হযরত মাওলানা মুবাশ্বির আলী তেলিটিকরী (র.), কাছাড়, আসাম, ভারত।

৬। হযরত মাওলানা মুবাশ্বির আলী (র.), লাঠিমারা, কাছাড়, আসাম, ভারত।

৭। হযরত মাওলানা আব্দুল জব্বার ছাহেব, চাঁদপুর, কুমিল্লা।

৮। হযরত মাওলানা মাহবুবুর রহমান ছাহেব, ফেনী, নেয়াখালী।

৯। হযরত মাওলানা শাতির আলী গর্দিশপুরী (র.), জকিগঞ্জ, সিলেট।

১০। হযরত কারী আহমদ আলী (র.), আটগ্রাম, জকিগঞ্জ, সিলেট।

১১। হযরত মাওলানা আব্দুল মজিদ (র.), জুলাই, কানাইঘাট, সিলেট।

১২। হযরত মাওলানা মুহসিন (র.), কানাইঘাট, সিলেট।

১৩। হযরত হাফিজ আপ্তাব খান (র.), আলালপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।

১৪। হযরত পীর ছিদ্দিক আলী (র.), বিয়ানীবাজার, সিলেট।

১৫। হযরত মাওলানা ওয়াসির আলী (র.), নালবহর, বিয়ানীবাজার, সিলেট।

১৬। হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব (র.), আউশকান্দি, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

১৭। হযরত মাওলানা ওয়াছিল আলী (র.), বর্ণী, বড়লেখা, মৌলভীবাজার।

১৮। হযরত সৈয়দ আজফর আলী (র.), ভাদেশ্বর, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

১৯। হযরত মাওলানা মজহর আলী (র.), পাখিয়ালা, বড়লেখা, মৌলভীবাজার।

২০। হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মোশাহিদ বায়ূমপুরী (র.), কানাইঘাট, সিলেট।

২১। হযরত হাফিজ আব্দুর রশীদ (র.), দাড়িপাতন, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

২২। হযরত হাফিজ মোজাম্মিল আলী (র.), তৈকামাল, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

২৩। হযরত মাওলানা কারী কমর উদ্দিন (র.), মাথিউরা, বিয়ানীবাজার, সিলেট।

২৪। হযরত মুন্‌শী আশরাফ আলী (র.), হাসানপুর, করিমগঞ্জ, আসাম, ভারত।

২৫। হযরত মাওলানা আব্দুশ শাকুর (র.), এখতিয়ারপুর, মাধবপুর, হবিগঞ্জ।

২৬। হযরত মাওলানা খলিলুর রহমান (র.), লাঠিমারা, কাছাড়, আসাম, ভারত।

২৭। হযরত মাওলানা জফর আলী (র.), বোয়ালীপার, কাছাড়, আসাম, ভারত।

২৮। হযরত মাওলানা ওয়াজিদ আলী (র.), তুখারবন্দ, হাইলাকান্দি, আসাম, ভারত

২৯। হযরত কারী আমজদ আলী (র.), দীঘিরপাড়, বদরপুর, আসাম, ভারত।

৩০। হযরত মুন্‌শী আব্বাছ আলী ওরফে আফাজ আলী (র.), শিলচর, আসাম, ভারত।

৩১। হযরত সৈয়দ আব্দুল বাকী (র.), উদারবন্দ, শিলচর, আসাম, ভারত।

৩২। হযরত মাওলানা আরজুমন্দ আলী (র.), হাইলাকান্দি, আসাম, ভারত।

৩৩। হযরত মাওলানা আবদুর রহমান (র.), কনকলস, করিমগঞ্জ, আসাম, ভারত।

৩৪। হযরত মুন্‌শী মোহাম্মদ মুহসীন (র.), মহাকল, করিমগঞ্জ, আসাম, ভারত।

৩৫। হযরত মাওলানা মছদ্দর আলী (র.), নগাঁও, হোঁজাই, আসাম, ভারত।

৩৬। হযরত মুন্‌শী আব্বাস আলী (র.), মুড়াঝার, নগাঁও, হোঁজাই, আসাম, ভারত।

৩৭। হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল লতিফ চৌধুরী ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.), জকিগঞ্জ, সিলেট।

[উপরোক্ত তালিকা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তৈরি করায় বদরপুরী (র.) এর নিকট থেকে তরীকতের সনদপ্রাপ্ত কোনো খলীফার নাম বাদ পড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কারও জানা থাকলে তা জানিয়ে আমাদের কৃতার্থ করতে অনুরোধ রইলো। পরবর্তী সংস্করণে ইনশাআল্লাহ তা যত্নের সাথে ছাপানো হবে।] - লেখক

ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর প্রতি আচরণ ও নসীহত

পীরানে পীর হযরত বদরপুরী (র.) এর স্নেহচ্ছায়ায় যাঁরা ধন্য হয়েছেন, তাদের অন্যতম হলেন মুজাদ্দিদে যামান হযরত আল্লামা আব্দুল লতীফ চৌধুরী ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.)। তিনি হযরত বদরপুরী (র.) এর খলীফাদের অন্যতম এবং জামাতাও। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ আজ দুনিয়া জুড়ে এক সুপরিচিত নাম। আল্লাহর দ্বীনের স্বার্থে এমন খুব কমই কর্ম আছে যাতে তিনি সম্পৃক্ত নন। পৃথিবীর অনেক দেশের বহু স্থান জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে তাঁর সুবিশাল খিদমতের পরিমণ্ডল। কি ইহলৌকিক, কি পরলৌকিক সব

বিষয়েই লক্ষ-কোটি মানুষ তাঁর নিকট থেকে লাভ করে আসছে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। মসজিদ, মাদরাসা, মক্তব, এতিমখানা, লঙ্গরখানা, বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা, বিধবা আশ্রম, দুঃস্থ পুনর্বাসন প্রকল্প, গণ সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, সাহায্য সংস্থা, পত্র-পত্রিকা, সৃজনশীল প্রকাশনা, পাঠাগার, বৃত্তি প্রকল্প ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ছাড়াও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশুদ্ধ আকিদা বিশ্বাসে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং ওয়াজ মাহফিলে বলিষ্ঠ আহ্বান জানিয়ে গেছেন। এসবের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কেবল নিজেই সুখ্যাতি বা পরিচিতি লাভ করেননি। মহান মুর্শিদ কিবলাহ্ হযরত বদরপুরী (র.) কেও অমর করে রেখেছেন তিনি। মুর্শিদের রেখে যাওয়া আমানতের যথাযথ মূল্যায়ন এবং সিলসিলার খিদমত আঞ্জামে তিনিই যে সর্বাধিক সফল্যের দাবীদার একথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

হযরত বদরপুরী (র.) এর সাথে ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর প্রথম পরিচয় এক শোকাবহ মুহূর্তে। তিনি তখন ১২/১৩ বছরের এক কিশোর মাত্র। সে দিনটি ছিলো এই ফুটফুটে সুন্দর কিশোরের জীবনে চরম এক দুর্দিন। নিতান্ত শিশুকালে স্নেহময়ী জননীকে হারিয়ে পিতার অপত্য স্নেহে-বাৎসল্যে ভুলে ছিলেন মায়ের শূন্যতা। পিতা ছিলেন তাঁর কাছে পিতা ও মাতার মিলিত স্নেহ-ভালোবাসা ও আদর-আবদারের উৎস। আদিগন্ত কুয়াশাঘেরা এক কনকনে শীতের রাতে আদর-স্নেহের উষ্ণতা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হলেন কিশোর ফুলতলী ছাহেব। ইন্তিকাল করলেন তাঁর স্নেহময় পিতা স্বনামখ্যাত আলিম হযরত মাওলানা মুফতি আব্দুল মজিদ (র.)। শীত রাতের আঁধার আর ঘন কুয়াশা কাটার আগেই তার মাথার উপর থেকে সরে গেলো অমূল্য পিতৃচ্ছায়া। স্নেহ-মায়া-মমতা বঞ্চিত হয়ে নিরাবলম্বন হয়ে পড়লেন তিনি। বড় ভাই তাঁর থেকে মাত্র ৩/৪ বছরের বড়। তার পক্ষেও তাকে প্রবোধ দেওয়া, নিবিড় স্নেহ-মমতায় জড়িয়ে রাখা সম্ভব ছিলো না। কাজেই, মাতৃহীন কিশোর পিতৃহীন হলেন, স্নেহ-মায়া-মমতার ছায়া থেকে হলেন বঞ্চিত। আগের দিন হযরত বদরপুরী ছাহেব কিবলাহ যাচ্ছিলেন মাইল তিনেক দূরের আটগ্রামে। যাবার পথে তিনি দেখতে এলেন মুফতি ছাহেবকে (ফুলতলী ছাহেবের আব্বা)। দেখার পর তিনি সফর বাতিল করলেন। আটগ্রাম না গিয়ে

থেকে গেলেন পাশের গ্রামে। আর এই রাতেই ইন্তিকাল করেন মুফতি ছাহেব। পরদিন মুফতি ছাহেবের জানাযায় ইমামতি করলেন বদরপুরী ছাহেব কিবলাহ। কিশোর ফুলতলী ছাহেব এই প্রথম অনুভব করলেন তাঁর পিতা মুফতি ছাহেবের সাথে বদরপুরী ছাহেব কিবলাহর ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতার বিষয়টি। জানাযার পর দাফনকার্য চলেছে, লাশ কবরে শোয়ানো হচ্ছে। উপস্থিত সবার দৃষ্টি সেদিকে। কিন্তু, কেউ দেখলেন না, গত রাতে যার মাথার উপর থেকে সরে গেছে স্নেহচ্ছায়া, সেই এতিম শিশু ফুলতলী ছাহেব নিশ্চুপ নিথর বসে আছেন কবরের এক পাশে। তার অপলক দৃষ্টি কবরের শীতল মাটিতে রাখা শ্বেত-শুভ্র কফিনে মোড়ানো পিতার লাশের উপর। এই কায়াহীন শ্বেত-শুভ্রতা ভেদ করে আর কোনোদিন স্নেহময় পিতার প্রাণবন্ত মুখখানি কাছে পাবেন না। পারবেন না তার স্নেহের উষ্ণতা মাখা বুকে কচি মুখখানি রাখতে। জীবনে আর কোনোদিন পিতার চরণতলে বসতে পারবেন না, পারবেন না পিতার স্নেহসুধায় নিজের হৃদয়কে স্নিগ্ধ শীতল করতে। হারানোর এই বেদনা যে অসীম শূন্যতা হয়ে তার কচি হৃদয়ে কান্নার বিশাল ব্যাপ্ত তরঙ্গ হয়ে ভাঙছে, তার আদিগন্ত গ্রাস করা শব্দ প্রকাশের শক্তি কোথায় এই কচি বুকে! তাই নীরব নিঃশব্দ কান্নায় ভাসছেন তিনি। তাঁর গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অবিরল অশ্রুধারা। সেই চোখের পানির একেকটি ফোঁটা পিতা হারানোর, মাথার উপর ছায়া হারানোর বেদনা ও হাহাকার নিয়ে মিশছে কবর থেকে তোলা মাটিতে, যে মাটি অল্প পরেই ঢেকে দেবে তাঁর পিতার প্রাণহীন দেহখানি। তাঁর ঝরে পড়া অশ্রু, এই নীরব কান্নায় শুধু বেদনা আর আহাজারিই নয়; বরং ছিলো পরম দয়াময়ের দরবারে মরহুম পিতার রুহের মাগফিরাতের কামনাতেও সিক্ত। মহান আল্লাহই মানবের জন্য অনন্ত স্নেহের উৎস, এই চির সত্য সেদিনের কিশোর ফুলতলী ছাহেব নিজের মতো করে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই বোধ হয় রাহমানুর রাহীম খুলে দিলেন তাঁর রহমতের অশেষ দ্বার। তিনি সহসা অনুভব করলেন তার পিঠে গভীর উষ্ণ পরশ এবং মাথার উপর স্নিগ্ধ শীতল ছায়া। তিনি অবাক হলেন, চমকে উঠলেন। কেননা, এহেন উষ্ণ পরশ, স্নেহচ্ছায়া তিনি চিরতরে হারিয়েছেন গত রাতে। কিশোর ফুলতলী ছাহেব ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, যে বুক তাকে স্নেহের উষ্ণ পরশ দিচ্ছে, যে জামা-পাগড়ী তাকে ছায়া দিচ্ছে তা আর কারও নয়, খোদ বদরপুরী ছাহেব কিবলাহর।

মমতা মাখানো পবিত্র সেই পরশে কিশোর ফুলতলী ছাহেবের মনে বেদনার মধ্যেও এনে দিলো প্রশান্তির ছোঁয়া। অচেনা এক অনুভূতি মুহূর্তে দেহ-মনকে পুলোকিত করে কচি মনের গভীরে বদরপুরী ছাহেবের প্রতি সৃষ্টি হলো এক রূহানী আকর্ষণ। বদরপুরী ছাহেবও সম্ভাবনাময় সুপ্ত প্রতিভার অধিকারী এতিম শিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে সান্তনা দিলেন তাঁকে এবং এ বলে গেলেন যে, সময় সুযোগে তার সাথে দেখা করতে।

বদরপুরী (র.) সেই উষ্ণ পরশ ও স্নেহচ্ছায়া নিছক প্রবোধের ছিলো না; ছিলো ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিতও। সেদিনকার এই ছায়া কিশোর-যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে এসেও যেন ফুলতলী ছাহেব কিবলাহকে ঢেকে রেখেছে সমানভাবে।

এরপর মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ফুলতলী ছাহেব হাইলাকান্দি মাদরাসায় ভর্তি হলেন। কিছুদিন পর একদা বদরপুর দিয়ে যাওয়ার সময় বদরপুরী ছাহেবের সাথে দেখা হলো তার। খোঁজ-খবর নিয়ে বদরপুর আলিয়া মাদরাসায় এসে উচ্চ মাধ্যমিক জামাতে ভর্তি হতে বললেন বদরপুরী ছাহেব। তার কথামতো ফুলতলী ছাহেব বদরপুর আলিয়ায় ভর্তি হলেন। পীর-ওলীগণের মাযার যিয়ারত তার খুব ভালো লাগতো। আধ্যাত্মিকতা এবং বদরপুরী ছাহেব কিবলাহর প্রতি তার মনে ছিলো তীব্র আকর্ষণ। কিসের যেন এক টান সর্বদা অনুভব করতেন মনে। কিন্তু ঠিক নিশ্চিত হতে পারছিলেন না- কোথায় কার নিকট বায়আত হবেন। অনেকটা সিদ্ধান্তহীনতার মধ্যেই এক রাতে স্বপ্নে দেখলেন, বদরপুরী ছাহেব কিবলাহ নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় বরই (কুল) গাছের নিচে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। স্বপ্ন দেখে জেগে গেলেন তিনি। রাত তখন ২টা, ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন তরুণ ফুলতলী ছাহেব স্বপ্নের কোনো ব্যাখ্যা বুঝতে পারলেন না। উযূ করে দুই রাকাআত নামায পড়ে আবার শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আবারো সেই একই স্বপ্ন, একই ইশারা। এবার জেগে গেলেন তিনি, স্বপ্নের নিগুঢ় তাৎপর্য বুঝতে তাঁর বাকী রইলো না। আবার উযূ করে লজিং থেকে বেরিয়ে পড়লেন পার্শ্ববর্তী গ্রাম বুন্দাশীলের উদ্দেশ্যে, বদরপুরী (র.) এর বাড়ি যেখানে। গভীর রাতে ছাহেব বাড়িতে পৌছে দেখেন, স্বপ্নে যে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বদরপুরী ছাহেব তাকে ডাকতে দেখেছেন, ঠিক সেই গাছের নিচে দাড়িয়ে আছেন তিনি। আলো আঁধারের মাঝে মানুষের অস্তিত্ব অনুমান করে বদরপুরী ছাহেব কিবলাহ তার নাম ধরে বললেন, আব্দুল লতিফ এসেছো? তিনি সালাম দিয়ে জবাব দিলেন।

ছাহেব উযূ আছে কিনা জানতে চাইলে ফুলতলী ছাহেব বললেন, আছে। আর কোনো কথা না বলে ভিতর বাড়ির নিজের কামরায় নিয়ে হাতে ধরে বায়আত

করালেন, তা'লীম-তাওয়াজ্জুহসহ সবক বাতলিয়ে দিলেন। এ-ই শুরু এবং এভাবে এক পর্যায়ে এসে তরীকতের খিলাফত প্রদান এবং কনিষ্ঠ ছাহেবজাদীকে বিয়ে দিয়ে বদরপুরী (র.) ফুলতলী ছাহেব কিবলাহকে আরও গভীর বন্ধনসূত্রে আপন করে নিলেন।

দেখতে দেখতে কেটে গেলো বছরের পর বছর। এর মধ্যে কয়েক জায়গায় শিক্ষকতা ছাড়াও বিভিন্ন সভায় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য, ওয়াজ-নসীহত করতে থাকেন। ফলে, তার আধ্যাত্মিক খ্যাতির পাশাপাশি ব্যক্তিত্বের প্রকাশও ঘটল অতি দ্রুত। বলাবাহুল্য, ওয়াজ-নসীহতে ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর তেমন অভ্যাস বা আগ্রহ প্রথম জীবনে ছিলো না। তদুপরি, একদিন বদরপুর ঈদগাহ ময়দানে তিনদিনব্যাপী মাহফিল ছিলো। দ্বিতীয় দিন বদরপুরী ছাহেব ফুলতলী ছাহেবকে বয়ান করার কথা বললেন। ফুলতলী ছাহেব রামপুর থেকে কামিল পাশ করে সদ্য শিক্ষকতায় যোগদান করেছেন। ইতিপূর্বে কোনো দিন তিনি বয়ান করেননি। তিনি অনেকটা ঘাবড়ে গিয়ে ইতস্তত করতে লাগলেন। এরই মধ্যে বদরপুরী ছাহেব বললেন, না, আজ নয়, আগামী কাল তিনি বয়ান করবেন। ফুলতলী ছাহেব আপাতত; রক্ষা পেলেন। কিন্তু, পর দিন বদরপুরী ছাহেব নিজের সাথে নিয়ে এসে পাশে বসে ফুলতলী ছাহেবের হাতে মাইক দিয়ে বয়ান করতে নির্দেশ দিলেন। শুরু হলো জীবনের প্রথম বয়ান। সকাল ১০টা থেকে যুহরের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত একটানা বয়ান করলেন ফুলতলী ছাহেব। প্রথম পর্যায়ে তার এই কয়েক ঘন্টা বয়ান নিছক ওয়াজ-নসীহতই ছিলো না; এর সুর-ঝঙ্কার, উপস্থাপনা, দলীল-প্রমাণও ছিলো প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। শানে লোকজন ছুটে আসতে থাকে তাঁকে দেখার জন্য। মাহফিল শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো লোকই বসা থেকে উঠেনি। বয়ান শেষ হলে অন্য পাশে বসা কৌড়িয়ার হযরত মাওলানা আব্বাছ উদ্দিন ছাহেব (র.) বদরপুরী ছাহেবকে বললেন, ছাহেব! এই ছেলের (ফুলতলী ছাহেব) জন্য একটু দুআ করা কি উচিৎ নয়? বদরপুরী ছাহেব বললেন, আপনি করুন। কিন্তু, আব্বাছ উদ্দিন ছাহেব বদরপুরী ছাহেবকে দিয়েই উপস্থিত সকলকে নিয়ে ফুলতলী ছাহেবের জন্য দুআ করালেন। সেই দুআ হয়তো ফুলতলী ছাহেবের জীবনের এক পরম প্রাপ্তি ছিলো।

এভাবে বদরপুরী (র.) তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলীফা হিসেবে ফুলতলী ছাহেবকে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে গড়ে তুলেছিলেন নিজের মতো করে। আধ্যাত্মিক ও জাগতিক বিষয়াবলির সুগভীর পরিপক্কতা অর্জনে হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহকে বদরপুরী (র.) স্বীয় মানসপুত্রের ভূমিকায় টেনে এনেছিলেন। সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্যের ক্ষেত্রেও ফুলতলী ছাহেব ছিলেন বদরপুরী (র.)

এর স্বনির্বাচিত প্রতিনিধি স্বরূপ। বলতে গেলে তার জীবনের সকল প্রাপ্তি ও অর্জনের সাথে রয়েছে বদরপুরী (র.) এর স্নেহচ্ছায়া ও রূহানী তাওয়াজ্জুহ। হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ স্বীয় মুর্শিদ কুতবুল আউলিয়া হযরত বদরপুরী (র.) এর স্থলাভিষিক্ত খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে আজ যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন, তা তাঁর প্রতি বদরপুরী (র.) এর সুদৃষ্টি ও মূল্যায়নেরই ফসল।

হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) তাঁর প্রতি বদরপুরী (র.) এর অসিয়ত ও নসীহত এবং মুর্শিদ কিবলাহর সাথে সংশ্লিষ্ট নিজের জীবনের বিশেষ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, আমার প্রতি হযরত বদরপুরী (র.) এর আচরণ ও নসীহতের কথা বলে শেষ করার মতো নয়। তিনিতো শুধু আমার পীর-মুর্শিদ ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমার পিতৃতুল্যও। সেই কিশোর বয়স থেকেই তাঁর স্নেহ-ভালোবাসা যেভাবে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলো, তেমনি তিনিও আমার মাথার উপরে ছায়া হয়েছিলেন। তরীকতের দায়িত্ব আঞ্জাম থেকে শুরু করে মানুষের কল্যাণ, সব ক্ষেত্রেই তাঁরই তা'লীম-তরবিয়াত আমাকে এখনো পরিচালিত করছে। জীবনের সার্বিক দিক নির্দেশনা তাঁর নিকট থেকেই লাভ করেছি। জানিনা, কতটুকু রপ্ত করতে পেরেছি, তবে, আমার চিন্তা-চেতনায় তাঁর আদর্শই প্রাধান্য ছিলো। তিনি আমাকে যেভাবে স্নেহ করতেন, বিশ্বাসও করতেন সেভাবে। কাজেই, বিভিন্ন বিষয়ে সময় সময় আমাকে ডেকে পাঠাতেন। কোনো কাজে তিনি সময় দিতে না পরলে আমাকে দুআ দিয়ে সেখানে পাঠাতেন। আমার জীবনকে সুন্দর করে সাজাতে তাঁর প্রচেষ্টা ছিলো খুবই আন্তরিক। অন্যান্য বিষয় ছাড়াও তরীকতের তা'লীম গ্রহণের ব্যাপারটিও তিনি গুরুত্বের লক্ষ্য রাখতেন।

একবার হযরত বদরপুরী ছাহেব কিবলাহ আমাকে সংবাদ দিলেন যে, আমি যেন 'হিজবুল বাহারের' চিল্লায় গিয়ে বসি। সংবাদ পেয়ে আমি 'হিজবুল বাহার' কিতাব সাথে নিয়ে বদরপুর গিয়ে পৌঁছলাম। ছাহেবের সাথে দেখা হওয়ার পর হিজবুল বাহারের ওযীফা দেখতে চাইলেন। সঙ্গে নেওয়া ওজিফাখানা দেখে বললেন, এতে কিছুটা ভুল রয়েছে। তার নিজ হাতে লেখা হিজবুল বাহারের ওজিফা বাড়ি থেকে এনে আমাকে দিলেন। আমি সেই ওজিফা পড়া শুরু করলাম। যুহরের নামাযের সময় ছাহেবকে বললাম যে, ওজিফা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। তাকে মুখস্থ পড়ে শোনালাম। তিনি শোনে খুশি হলেন এবং ঐ দিন (মঙ্গলবার) বুন্দাশীলের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া

বরাক নদীর তীরস্থ পশ্চিমের মসজিদে আমাকে চিল্লায় বসালেন। প্রত্যেক দিন আসরের পর ছাহেব আমাকে ইশারায় জিজ্ঞেস করতেন, ওজিফা পড়া শেষ হয়েছে কিনা। আমি কাগজে লিখে ওজিফা পড়া শেষ হওয়ার কথা জানাতাম। এভাবে শুক্রবার দিন পর্যন্ত চিল্লায় কাটালাম। শেষ দিন অর্থাৎ শুক্রবারে তিনি একটি বকরী দিয়ে শিরণী করলেন এবং বাদ মাগরিব আমাকে চিল্লা থেকে বের করলেন।

চিল্লায় বসাকালীন আমার মনে আসতো যে, আমি বাতাসের মধ্য দিয়ে উড়ে যেতে পারবো। এমনকি চার দিকে লক্ষ্য করলে সব কিছুই রৌশনীতে উজ্জ্বল দেখতাম। ছাহেব আমার এই অবস্থা বুঝে আমাকে বের করে নিয়ে ছাহেব বাড়ির বাংলার একটি কামরায় আবদ্ধ করে রাখলেন। ভেতরে আমার খাবার ও উযূর পানি দেওয়া হয়, তারপর যথারীতি তালা দিয়ে দেওয়া হয় দরজায়। এভাবে তিন দিন পর্যন্ত বন্ধ ঘরে নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটাই। চোখে কোনো ঘুম নেই, সময় সময় শরীরের গরমী বাড়তে থাকে। এমনকি শরীরে পাখির মতো উড়ে যাবার শক্তি অনুভব করলাম। চতুর্থ দিন হাতে একটি তেলের শিশি নিয়ে ছাহেব ঘরে ঢুকলেন। আমাকে কিজ্ঞেস করলেন তৈল মাখব কিনা। আমি হ্যাঁ বললে নিজ হাতে মাথায় তৈল মাখালেন। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে জেগে দেখি পূর্বের কোনো অবস্থাই আর নেই। রৌশনী আর গরমী কিছুই নেই। আমি ছাহেব কিবলাহর নিকট এসবের বর্ণনা দিলে, ছাহেব বললেন, 'কাশফ অনেক সময় মানুষকে গুমরাহ করে। বাবা! মক্কা শরীফ যেতে রওয়ানা হয়ে বুম্বাইর তামাশা দেখতে লাগলে হজ্জ শেষ (ফউত) হয়ে যাবে।'

হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ বলেন, একবার চিশতিয়া তরীকার চিল্লাহ দিতে বদরপুরী ছাহেব কিবলাহর নির্দেশে আমি কাছাড়ের নাতানপুর পাহাড়ে গেলাম। মসুদ আলী নামের স্থানীয় এক ব্যক্তি চিন্তায় থাকাবস্থায় আমার দেখাশোনার দায়িত্ব নিলেন। তিনি পাহাড়ে একটি হুজরা তৈরী করে দিলেন। আমি তাতে চিল্লায় বসলাম। হুজরা বা ঝুপড়িতে কোনো দরজা না থাকায় বেড়ার ফাঁকা অংশের সামনে আগুনের ধুনী বা শিখা জ্বালিয়ে রাখা হতো। যাতে হিংস্র জীব-জন্তু হুজরায় প্রবেশ করতে না পারে। রাতে বাঘ এসে আমার পেছনে ধুনীর পশ্চিমে বসে আগুন পোহাতে লাগলো। তার গন্ধ পেলাম ও ছায়া ধুনীর আলোতে পশ্চিমের বেড়ায় দেখা গেলো। এভাবে চার রাত বাঘ এসে বসলো। যখন মসুদ আলী গেলেন, তাঁকে কাগজে লিখে দরজা লাগানোর কথা জানালাম। তিনি দরজা বানিয়ে বসালেন। হুজরার বেড়া

ছিলো খাগনলের যার জন্য ফাঁক দিয়ে ভেতর থেকে বাহির এবং বাহির থেকে ভেতর অনায়াসেই দেখা যেতো। রাতে যিকিরের সময় দেখতাম পাহাড়ের সারা টিলায় বসে সাদা পোষাক পরিহিত লোকজন আমার সাথে যিকির করছে। আমি ভেবেছিলাম তারা পাহাড়ের ইলিয়াছ আলী সাহেবের লোকজন। এরই মধ্যে একদিন ছাহেব কিবলাহ (বদরপুরী ছাহেব) এর আওয়াজ শুনলাম, এদের দিকে লক্ষ্য করো না। এরপর থেকে এগুলোর প্রতি লক্ষ্য না করে চিল্লাহ শেষ করি। ফিরে এসে যখন ছাহেবের খিদমতে উপস্থিত হই, তখন বার বার বলেন, তুমি কি ভয় পেয়েছিলে? উত্তরে আমি কিছুই বললাম না। তিনি নিজেই ফরমালেন, 'দরিন্দা, পরীন্দা বা পশু-পাখি সবই আল্লাহর হুকুমের গোলাম।'

এরপর আমি সব ঘটনা বললাম। শুনে হেসে ফরমালেন, এ সময় তোমার মন কোনো দিকে গিয়েছিলো। অর্থাৎ তুমি কি তখন তাদের ভয় করেছিলে? আমি বললাম, তখন আল্লাহর সাহায্যই আমার কাম্য ছিলো। ছাহেব কিবলাহ ফরমালেন, এটা ছিলো তোমার জন্যে একটা পরীক্ষা।

উপরোক্ত ঘটনা থেকে আমার মনে বিশ্বাস হলো, তালিব যত দূরেই থাকেন না কেন, মুরশিদের নেক নজর তার উপর সব সময় থাকে। আর এ সময় আমার প্রতিও বদরপুরী ছাহেবের নজর বা খেয়াল অবশ্যই ছিলো। তিনি আমার সব অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন।

আরেকটি ঘটনার বর্ণনায় ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ বলেন, আমাকে তিনি প্রায়ই নসীহত করতেন যে, তুমি আঁটসাট কিছু করো না, তোমার চলবে না। আমার বাড়ির সামনের পুকুর খননের পর ঘাট বাঁধা হয়েছিলো, তিনি তা খুলে আরও বড় পাথর দিয়ে প্রশস্ত করে ঘাট বাঁধার হুকুম করেছিলেন। এরপর ঘাটের আয়তন অনেক বড় করেছিলাম। তখন মনে আসতো এত বড় ঘাটের কি প্রয়োজন, কিন্তু এখন বুঝতেছি, ঘাট আরও কয়েকগুণ বড় হলেও প্রয়োজন মিটবেনা।

ছাহেব কিবলাহ সময় সময় আরও বলতেন, 'তুমি অবসর থাকতে তরীকতের মেহনতসহ যা করার করে নাও। একদিন বললাম, ছাব! পরে কি হবে? ফরমালেন, মানুষ তোমাকে ঘিরে ফেলবে, কোনো কাজ করার সময় পাবে না।'

জ্বীনদের সাথে শত্রুতা বা মিত্রতা না করার জন্যও নির্দেশ দিতেন। বলতেন, ওদের সাথে লাগবে না, ওদেরকে পাশে স্থানও দিবে না। অন্য এক প্রসঙ্গে ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর স্মৃতিচারণ ও কাছাড় জেলার বড়খলায় এক মহিলা নিজেকে পীর বলে দাবী করে। তার পিতা আলিম ছিলেন, তাই কন্যাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতেন। নানা আজগুবি তথ্য সে বলতে লাগলো। ফলে,

লোকজন ভিড় জমাতে থাকে তার নিকট। কিছু দিন যেতে না যেতে লোক সমাগম এতো বাড়লো যে, বাড়ির সামনে হোটেল বসানো হলো। লোকজন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মহিলার নিকট গেলে সে অকপটে সব কিছু বলে দিতে পারে। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বদরপুর গিয়ে ছাহেব কিবলাহকে এই বিষয়ে জানালেন। ছাহেব আমাকে (ফুলতলী ছাহেব) খবর দিয়ে নিয়ে ফরমালেন, 'তুমি বড়খলায় যাও।' আর কিছুই বললেন না। এ দিন রাতের ট্রেনে করে আমি জয়নগর পৌঁছে চৌধুরী বাড়িতে রাতে থাকলাম। ঐ রাতেই একদল জ্বীন আমার কাছে এসে বললো, হযরত ছাহেব আপনাকে পাঠিয়েছেন, আপনি দয়া করে বড়খলায় না গিয়ে এখান থেকে তশরিক নিয়ে যান। আমরা এই মহিলার নিকট আর থাকবো না, সরে যাবো। পরদিন ট্রেন ধরে বদরপুর ফিরে আসলাম। ছাহেব কিবলাহকে জ্বীনদের অনুরোধের কথা জানালাম। ছাহেব হেসে ফরমালেন, যাক, পিরাকীর বাজার ভেঙ্গে গেছে।'

অনুরূপ জকিগঞ্জ থানার পশ্চিমের মাতারগ্রামে ইরফান আলী নামে এক লোক দাবী করলো সে সতেরো বছর পর কবর থেকে জীবিত হয়ে ফিরেছে। সে ১৭ বছর আগে মৃত ইরফান আলীর বিধবা স্ত্রীকেও তার ঘরে ফিরিয়ে আনলো। স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বিষয়টির সত্যতা জানতে বদরপুর গেলেন। ছাহেব কিবলাহ ঘটনা শুনে ফরমালেন, 'আমার দামানকে (জামাতা) নিয়ে যান।' কথা মতো তারা আমাকে (ফুলতলী ছাহেব) সাথে নিয়ে গেলো। কথিত ইরফান আলী তখন আমাকে দেখে ভয়ে রীতিমতো কাঁপতে শুরু করলো। আমি প্রথমে গ্রামবাসীদের ডেকে তাকে স্ত্রী ফেরত দেওয়ার জন্য সাশালাম। তারপর তাকে মারধর না করেই গোপনে বললাম, আজ রাতের মধ্যেই তুমি সরে না গেলে তোমার করুণ পরিণতি হবে। সত্যই, লোকটি রাতের অন্ধকারে পলায়ন করলো। এ ঘটনাও ছাহেব শুনে খুশী হয়েছিলেন। এভাবে তিনি সময় সময় আমাকে বিভিন্ন কাজের নির্দেশ দিতেন, আমি নির্দেশমতো কাজ আঞ্জাম দিতাম।

ফুলতলী ছাহেব সম্পর্কে বদরপুরী (র.) এর ভবিষ্যদ্বাণী

বদরপুরের জনাব মতিউর রহমান জানান, বদরপুর ছাহেব বাড়ি জামে মসজিদের তৎকালীন ইমাম মরহুম কারী আবদুর রকীব সাহেব তার কাছে বর্ণনা করেছেন, যখন ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ ভারতের উত্তর প্রদেশের রামপুরে উচ্চশিক্ষার্থে অবস্থান করছিলেন, তখন একবার তার মারাত্মক বসন্ত রোগ হয়। তিনি বদরপুরী ছাহেব কিবলাহকে রোগের কথা জানিয়ে দুআ

চেয়ে চিঠি লিখলেন। বর্ণনাকারী মরহুম আবদুর রকীব সাহেব যিনি বদরপুরী ছাহেবের একান্ত খাদিমদের একজন ছিলেন। তিনি বদরপুরী ছাহেবের খিদমতে প্রেরিত চিঠিপত্র পড়ে শুনাতেন এবং ছাহেবের চিঠি লেখার কাজও আঞ্জাম দিতেন। তিনি বলেন, আমি প্রাপ্ত চিঠিখানা খুলে ছাহেবকে পড়ে শুনাতে লাগলাম। আমি একদিকে চিঠি পড়ছিলাম আর অপর দিকে ছাহেব অঝোরে কাদছিলেন। পড়া শেষ হলে আমাকে বললেন, "আব্দুর রকীব! এসো, দুআ করি। আমাদের সাথে তো ফিরিশতারাও আছেন, তাদের নিয়ে দুআ করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ দরখাস্ত কবুল করবেন।" এই বলে তিনি দুআর জন্য হাত উঠালেন এবং অনেক্ষণ কেঁদে কেঁদে দুআ করতে থাকলেন। দুআ শেষে বদরপুরী ছাহেব বললেন, "আল্লাহ যদি তাকে (ফুলতলী ছাহেবকে) এই রোগ থেকে মুক্তি দেন তাহলে তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করবেন বলে আমি আশাবাদী এবং তার মাধ্যমে আল্লাহ দুনিয়ার এক অংশ রৌশন করবেন।" আল্লাহর ওলীর পবিত্র মুখের কথা এবং তাঁর ঐকান্তিক আশাবাদকে আল্লাহ কবুল করেছেন। সত্যিই ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর মাধ্যমে আজ দুনিয়ার বিভিন্ন অংশের মানুষ হিদায়াত প্রাপ্ত হচ্ছেন। আল্লাহর নবীর উম্মতরা শুদ্ধ আকীদায় হচ্ছেন বিকশিত।

অধ্যায় : দশ

কারামত

নবীগণ থেকে সংঘটিত অলৌকিক ঘটনাবলীকে মু'জেযা বলে। মু'জেযা নবীগণের নবুওয়াতের প্রমাণ বহন করে। এমনি ওলীগণের মাধ্যমে সংঘঠিত অলৌকিক ঘটনাবলীকে কারামত বলা হয়। কারামত সত্য এবং ওলীর কারামত নবীর মু'জেযার অন্তর্ভুক্ত। কারণ ওলীগণ নিজের যোগ্যতা বলে কারামতের দাবীদার হতে পারেন না যতক্ষণ না নবী করীম (সা.) এর সাথে সুসম্পর্ক বা যোগসূত্র গড়ে উঠে। বেদায়া-নেহায়া কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, হুজুর (সা.) এর উম্মত ওলীদের কারামত নবী করীম (সা.)-এর মুজেযার বহিঃ প্রকাশ । আল্লাহ্ পাক ওলীদের দ্বারা কারামতের প্রকাশ ঘটিয়ে নবী করীম (সা.) এর স্মরণকে জারি রেখেছেন। যাদের অন্তরাত্মা প্রস্ফুটিত এবং

যাদের দ্বারা অসাধারণ কার্যাবলি সংঘটিত হয় তাদেরকে ছাহেবে কারামত বা কাশফ বলা হয়। হযরত বদরপুরী (র.) এই শ্রেণিভুক্ত ওলী ছিলেন। আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ যখন নিজেকে আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে সমর্পন করেন, তখনই তাদের কথা, কাজ আল্লাহর একান্ত নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। তাদের ইচ্ছা, আকাঙ্খা বা চাওয়া পাওয়ার প্রতি আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে অনেক অসাধ্যকে সাধন করে দেন যা আপাতঃ দৃষ্টিতে অলৌকিক মনে হয়। আর এটাই কারামত হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

ওলী আল্লাহগণের জীবনী আলোচনায় কারামত বা তাদের জীবনে সংঘটিত অলোকিক ঘটনাবলির কথা না এসে পারে না। ওলীর মান-মর্যাদা বুঝানোর উদ্দেশ্যে নয়, বরং কারামত বর্ণনার উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে, সংঘটিত কারামত বাস্তব চক্ষুর আড়ালে থাকে না, আর তা লোকমুখে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অথচ, সঠিক ইতিহাস না পাওয়ার কারণে কালক্রমে এতে সত্য-মিথ্যার অনেক কিছুই স্থান পেয়ে যায়। ফলে অনেক সময় নানা আজগুবি কল্পকাহিনী হয়ে গিয়ে সত্যকে আড়াল করে দেয়। তাছাড়া ওলী আল্লাহগণের জীবন-কর্ম আলোচনা বা জানার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নিকট নিজেকে সোপর্দ করার ব্যাপারে উৎসাহ লাভ করে থাকে।

হযরত বদরপুরী (র.) এর জীবন, কর্ম বাস্তবতার উর্ধ্বে ছিলো না। তদুপরি তার জীবনে নিজের অজান্তে অনেক কারামত সংঘটিত হয়েছে। তার এতো সাধারণ জীবন যাপনের ফাঁকেও এমন হাজারো ঘটনা রয়েছে যা বাস্তবতার উর্ধ্বে, অথচ সত্য। বলতে গেলে, আল্লাহর প্রিয় বান্দা নবী প্রেমিকদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এক একটি কারামত।

হযরত বদরপুরী (র.) কথা-বার্তা, কাজকর্ম বা ইবাদত বন্দেগী এমনভাবে করতেন যেন কেউ তাঁকে সকলের চেয়ে আলাদা না ভাবে। নিজেকে অতি সাধারণ মনে করা এবং গোপন রাখা ছিলো তার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া এমন অসংখ্য ঘটনাবলী থেকে নিম্নে কতিপয় ঘটনার আলোচনা করা হলো। আর এ সবই যথেষ্ট তথ্য নির্ভর ও সত্য।

ট্রেন দুর্ঘটনা থেকে হাজীগণ বেঁচে গেলেন

বাংলা ১৩৫১ সনে ভারতে মুসলমানদের সাথে হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। যে কারণে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার হজ্জ যাত্রীগণকে নিরাপদে কলিকাতায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেয়। ব্যবস্থানুযায়ী চাঁদপুর এবং গোয়ালন্দ হতে নিরাপত্তা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে বিশেষ ট্রেনযোগে মনিপুর, কাছাড় ও

সিলেটের সকল হাজীগণকে কলিকাতায় পৌঁছানো হবে। সকল হজ্বযাত্রী করিমগঞ্জ রেল ষ্টেশনে সমবেত হলেন। হযরত বদরপুরী (র.) তাঁর জামাতা ও খলিফা হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহসহ অন্যান্য মুরিদান এবং অপরাপর হাজী সাহেবদের বিদায় জানাতে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি রেলগেটের নিকটে আইস কোম্পানীর ম্যানেজার আব্দুস সোবহান সাহেবের ঘরে অবস্থান করছিলেন। বেশ কতক্ষণ কিবলামুখী ধ্যানমগ্ন থেকে হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, হজ্বের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আবার ফেরত গেলে কোনো অসুবিধা আছে কি? ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ না সূচক উত্তর দিলে তিনি ফরমালেন, তাহলে আজ বাড়ি ফিরে যান।

ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ আরজ করলেন, যেহেতু বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে এসে গেছি, তাই অনুমতি দিলে করিমগঞ্জ শহরে থেকে আগামীকাল রওয়ানা হয়ে যাবো। তিনি বললেন, না, বাড়িতে চলে যান। তিনদিন পর রওয়ানা করবেন।

আরও কিছু সময় ধ্যানমগ্ন থেকে হযরত বদরপুরী (র.) উদ্বিগ্ন হয়ে ফরমালেন, আজ কোনো হাজীই রওয়ানা করবেন না, সকলেই নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যান, তিনদিন পর রওয়ানা করবেন। যাত্রীগণ প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেলেও পরে সকলেই যাত্রা স্থগিত করে বাড়ির পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। কারণ বদরপুরী ছাহেবকে সকলেই জানতেন, তাই তাঁর কথার গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন তারা।

যাত্রীদের মধ্যে জকিগঞ্জ থানার মনসুরপুর গ্রামের নছিব আলী ও মটর মিয়া দুজনই কলিকাতায় জাহাজে চাকুরী করতেন। তাদের কলিকাতায় পৌঁছা খুব দরকার ছিলো। তাছাড়া তারা ভাবলেন, ছাহেব কিবলাহতো হজ্বযাত্রীদের নিষেধ করেছেন। সুতরাং, এই ট্রেনে তারা রওয়ানা করলেন। এই চাঁদপুর মেইল কমলা সাগর ষ্টেশনের নিকটে গিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনায় পতিত হয়। সারা ট্রেনে মাত্র তেরোজন লোক প্রাণে বেঁচেছিলো। বাকী সকলেই মারা গেলো। এমনকি কারোর লাশ পর্যন্ত পাওয়া গেলো না। মনসুরপুরের নছিব আলী ও মটর মিয়াও এই দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। ঠিক তিনদিন পর করিমগঞ্জের এসডিও জনাব ইয়াহইয়া খান সকল হজ্বযাত্রীদের সমবেত করে জগন্নাথগঞ্জ ঘাট দিয়ে অন্য পথে কলিকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। বদরপুরী (র.) এর জন্য কয়েক শত হাজী সাহেবান প্রাণে রক্ষা পেলেন। [ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাভাস

হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ বয়ান করেন, তিনি একদিন স্বপ্নে দেখেন যে, অসংখ্য শকুন মানুষকে এমনভাবে ধরে ধরে খাচ্ছে যেভাবে চিল মাছ ধরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। এই ভীতিকর স্বপ্ন দেখে তিনি হযরত বদরপুরী ছাহেব কিবলাহর খেদমতে বয়ান করেন। বদরপুরী ছাহেব কিবলাহ্ স্বপ্নের ঘটনা শুনে অঝোরে কাঁদতে থাকেন এবং বলেন শীঘ্রই হয়তো দুনিয়াব্যাপী এমন সংঘর্ষের সৃষ্টি হবে যে, বিশ্বের সব রাজা-বাদশাহরা পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। আর এই যুদ্ধের ফলে অসংখ্য মানুষ মরবে। স্বপ্নের বর্ণনা অনুযায়ী যেমনিভাবে মানুষকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে শকুনের দল, তেমনি যুদ্ধবাজ রাষ্ট্র প্রধানের হাতে সংখ্যাতীত মানুষ অঘোরে মরবে পথে-ঘাটে।

ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ বলেন, এর কিছুদিন পরই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আর বদরপুরী ছাহেব কিবলাহর তাবির অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে প্রাণহানি ঘটে সেই ভয়াবহ ইতিহাস বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাভাস সংক্রান্ত অন্য একটি ঘটনার বর্ণনায় হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ বলেন, তখনো বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়নি, কিন্তু বদরপুরী ছাহেব কিবলাহকে বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছিল। সে সময় রেঙ্গুনের সাথে আসাম ও এতদঅঞ্চলের মানুষের ব্যবসা ও চাকুরী সংক্রান্ত যোগাযোগ ছিলো। ছাহেবের মুরীদানদের মধ্যেও অনেকে ব্যবসা ও চাকুরীর সুবাদে রেঙ্গুনে অবস্থান করতেন। রেঙ্গুনের পরিস্থিতি জানার জন্য তিনি দাঁড়ির পাতনের হাফিজ আব্দুর রশীদ সাহেবকে সেখানে পাঠালেন। তিনি (আব্দুর রশীদ সাহেব) কিছুটা মজ্জুব ধরনের লোক ছিলেন। ছাহেবের নির্দেশ পেয়ে তিনি রেঙ্গুনে চলে যান।

হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ বলেন, একদিন গভীর রাতে ছাহেব বাড়ির টঙ্গীতে কাউকে এমনভাবে গলা ডাকাতে শুনলাম যে, মনে হচ্ছিল যেন জবাই করা গরু বিকট স্বরে গলা ডাকাচ্ছে। আওয়াজ শুনে ছাহেব কিবলাহ আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, দেখুনতো মনে হয় আবদুর রশীদ ফিরে এসেছেন। আমি বাহির বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, সত্যিই আবদুর রশীদ সাহেব ফিরেছেন এবং শেকড় সমেত একটি বাশ কাঁধে নিয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছেন আর গলা ডাকাচ্ছেন। আমাকে দেখে বললেন, "বাবা (বদরপুরী ছাহেব) আমাকে রেঙ্গুঁন পাঠিয়েছিলেন, আগুন লেগেছে, এ আগুন থামবে না, জ্বলে উঠবে, জ্বলে উঠবে" ইত্যাদি।

বদরপুরী ছাহেব কিবলাহ এসব শুনে খুব কাঁদলেন এবং বললেন, "মনে হয় যুদ্ধ লেগেই যাবে।" সত্য সত্যই কিছু দিনের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে

যায় এবং রেঙ্গুন সরকার সেখানে অবস্থানরত সকল ব্রিটিশ নাগরিক তথা ভারতীয়দেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ঘটনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে হযরত বদরপুরী (র.) ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর বাড়িতে স্বপরিবারে প্রায় চার মাস সময় অবস্থান করেন। সেসময় যোগাযোগের ক্ষেত্রে বদরপুরের অবস্থান ছিলো গুরুত্বপূর্ণ। রেল ও সড়ক পথে সৈন্যরা যাতায়াত করতো প্রতিনিয়ত। সড়ক ও রেলপথ ছেড়ে গ্রামের দিকে সৈন্যরা তেমন যাতায়াত করতো না। এ অবস্থায় গ্রাম ছেড়ে বদরপুরী ছাহেব কিবলাহর চলে আসার কারণ এলাকাবাসীর নিকট অজানা থেকে যায়। যার ফলে অনেকেই তাঁর অন্যত্র চলে যাবার প্রয়োজন ছিলো না বলে মন্তব্য করলেন।

এই দীর্ঘ চার মাস সময় ফুলতলীতেও তাঁর দৈনন্দিন কার্যাবলি যথা নিয়মে চলতো। মাগরিবের নামায শেষে তিনি কিবলামুখী হয়ে ধ্যানে বসতেন। এভাবে এশা পর্যন্ত তিনি ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এশার পর সামান্য কিছু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। রাত্রি বারোটার পর ঘুম থেকে জেগে উযূ করে নামায, তাসবীহ ইত্যাদি ইবাদত-বন্দেগী করতেন। এদিকে ফুলতলী ছাহেব সারাক্ষণ যথাসাধ্য মুরশিদের সান্নিধ্য বা তার খিদমতে ব্যস্ত থাকতেন। কি জানি কোনো অসুবিধা তার হচ্ছে কিনা! রাত্রে এতো অল্প ঘুমান দেখে ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ জানতে চাইলেন, তার কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা? তিনি জানালেন কোনো অসুবিধা নয়; কিছুক্ষণ ঘুমানোর পর এমনিই আর ঘুমাতে পারেন না। কোনো কোনো সময় গায়ে ব্যাথা হয় বলেই উঠে পড়েন।

একদিন মাগরিবের নামায শেষে ধ্যানে না বসে ঘর থেকে বের হয়ে পায়চারী করতে লাগলেন। কিছু পরপর দক্ষিণ পূর্ব দিকে চেয়ে চেয়ে হাত উঠিয়ে মোনাজাত করেন এবং কাঁদেন। ফাঁকে এশার নামায পড়লেন, কিন্তু কিছুই খেলেন না। সারাক্ষণ হাঁটেন এবং কিছুক্ষণ পরপর মোনাজাত করেন। অঝোরে তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। এ অবস্থায় বাড়ির সকলে অনেকটা চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহও তার সাথে সাথে আছেন। তিনি কাউকে কিছু বলছেন না। তাঁকেও কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। রাত প্রায় দুইটার পর ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর নিকট জানতে চাইলেন যে, এ মূহূর্তে একটা গরু ও বকরী পাওয়া যাবে কি না? ছাহেব কিবলাহ জানালেন, পাওয়া যাবে। ফরমালেন নিয়ে এসো। গরু ও বকরী আনা হলে এগুলোর মূল্য জানতে চাইলেন। ফুলতলী ছাহেব

কিবলাহ জানালেন, এগুলো আমার নিজের, মূল্যের প্রয়োজন হবে না। এগুলো জবেহ করে মিসকিনদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এতো গভীর রাতে মানুষ পাওয়া যায় কোথায়, মিসকিনইবা কে আসবে। তাই ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ্ ইতস্ততঃ করে বললেন, এতো রাতে না করে ফজরের পর জবেহ করলে কোনো অসুবিধা আছে কি? কিছু সময় নিরব থেকে ফরমালেন, ঠিক আছে, ফজরের পর পরই জবেহ করে নিও। তিনি আগের মতো হাঁটাহাঁটি ও একই দিকে চেয়ে মোনাজাত করতে থাকলেন, এভাবে ফজরের নামাজ আদায় করলেন। ধ্যানে না বসে রাতের মতো মোনাজাত ও হাঁটাহাঁটি করলেন, তখনও কিছু খেলেন না। সকাল আটটার সময় হতে অনেক্ষণ পর্যন্ত দক্ষিণ পূর্ব কোণের দিকে ফিরে ধ্যানমগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। উল্লেখ্য, ফুলতলী হতে দক্ষিণ পূর্ব কোণে প্রায় ১৫ মাইল দূরে বদরপুর। এক সময় হঠাৎ করে ঝড়ের মতো শব্দ শোনা গেলো। দেখা গেলো আকাশ প্রকম্পিত করে বহু সংখ্যক যুদ্ধ বিমান দক্ষিণ দিক থেকে ধেয়ে আসছে। ঠিক তখনই পশ্চিম দিক হতে ব্রিটিশ ও আমেরিকান যুদ্ধ বিমান বহর ফুলতলীর উপর দিয়ে উড়ে গেলো দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। দুদিক থেকে আসা যুদ্ধ বিমানগুলো বদরপুরের উপরে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। উভয় দলের বোমা নিক্ষেপে মনে হলো আকাশ থেকে অবিরাম আগুন পড়ছে। কিছু সময় পর বিকট শব্দ শোনা গেলো। শব্দের সাথে ভূকম্পনও হলো। দু'দল দূরে সরে পড়লো। জাপানীরা ফেরত গিয়ে জানালো, বদরপুরের উপর বোমার পর বোমা ছেড়ে সবকিছু ধ্বংস-নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এতক্ষণে সকলে বদরপুরী ছাহেবের পেরেশানীর কারণ বুঝতে পারলেন ঘটনার পরপরই তিনি ঘরে তাশরীফ নিলেন এবং নাস্তা খেলেন। তাঁকে বেশ সুস্থির দেখা গেলো। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বদরপুরের কিছুই হয়নি, নিক্ষেপ করা বোমাগুলো বাইশ মাইল দূরবর্তী দারবী চা-বাগানে গিয়ে পতিত হয়েছে। বদরপুরের লোকজন তখন ছাহেব কিবলাহর বাড়ি ছেড়ে আসার কারণ যে ধ্বংস থেকে বদরপুরকে রক্ষা করা এটাও বুঝতে পারলেন। [উপরোক্ত ঘটনাটি হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তারই সামনে সংঘটিত, আর তিনি নিজেই ইহা বর্ণনা করেছেন।]

কায়া মিশে গেলো হাওয়ায়

ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (মাদ্দাঃ) বদরপুর থাকাকালীন সময়ের এক ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, হযরত বদরপুরী ছাহেব কিবলাহ অনেক সময় কাঠের খড়ম ব্যবহার করতেন। একদিন শেষ রাতে খড়মের আওয়াজ শুনে

ভাবলাম ছাহেব হয়তো কোনো প্রয়োজনে বের হয়েছেন। ঘর থেকে বের হয়ে দেখলাম, ছাহেব মসজিদের দিকে যাচ্ছেন। আমিও পিছনে পিছনে গেলাম। দেখলাম মসজিদেই ঢুকছেন। কিছু সময় অপেক্ষা করে খোলা জানালা দিয়ে মসজিদের ভেতরে দেখার চেষ্টা করলাম। চাঁদনী রাতের আলোতে ভেতর পরিস্কার দেখতে পেলাম। দরজা দিয়েও ভেতরে দেখলাম, কিন্তু ছাহেবের কোনো অস্তিত্ব টের পেলাম না। আমার মনে কিছুটা ভয় আসলো, চলে আসলাম বাড়িতে। পরে ছাহেবের নিকট এই ঘটনার কথা বললে তিনি মুচকি হেসে ফরমালেন, 'শুগলে নফী' এর ধ্যানকালে অনেক সময় শরীরের অস্তিত্ব বিলুপ হয়ে যায়। তিনি শাহ ইমদাদ উল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র.) এর একটি ঘটনা তখন উল্লেখ করলেন, একদিন মুহাজিরে মক্কী (র.) কে গ্রেফতারের জন্য সৈন্যরা তাড়া করলো। তিনি তাদের সামনেই ঘোড়ার আস্তাবলে ঢুকে গেলেন। সৈন্যরাও ঢুকলো তাঁর পেছনে। খুঁজে খুঁজে তারা বললো, আপনি কি এখানে আছেন? তিনি বললেন হ্যাঁ। অথচ, সারা আস্তাবলে খুঁজে তাঁকে তারা পেলো না। তাঁর কথা তারা শুনছিলো ঠিকই কিন্তু শরীর বিলোপ হয়ে গিয়েছিলো।

পরাস্ত হলেন মজ্‌জুব দল

বদরপুরী বড় ছাহেবজাদা হযরত মাওলানা মাহমুদুর রহমান ছাহেব বর্ণনা করেন, সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার থানার ফেনগ্রাম নিবাসী হযরত পীর সিদ্দিক আলী (র.) ছোটবেলায় মারাত্মক অসুস্থ ছিলেন। অনেক চিকিৎসার পরও ছেলের রোগ নিরাময়ের কোনো লক্ষণ না দেখে মা-বাবা ছেলের বেঁচে থাকার আশাও এক রকম ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই নাজুক অবস্থার মধ্যেই একদিন এক মজ্‌জুব ফকীর এসে উঠলেন তাদের বাড়িতে। সিদ্দিক আলী সাহেবের মা অনেক কান্নাকাটি করে ছেলের অসুস্থতার কথা মজ্জুবকে বললেন এবং অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে আসলেন তার কাছে। মজ্‌জুব ছেলের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, ছেলেটি বড় হলে যদি আমাকে দিয়ে দাও, তবে সে সুস্থ হবে। মা মজ্‌জুবকে কথা দিলেন আল্লাহর রহমতে শিশু সিদ্দিক আলী সুস্থ হয়ে উঠলেন। সিদ্দিক আলী সুস্থ হওয়ার বছর কয়েকের মধ্যে সেই মজ্‌জুব একদিন তাদের বাড়িতে এসে সিদ্দিক আলীর মাকে ডাকাডাকি শুরু করলেন এবং তার ছেলেকে নিয়ে যেতে চাইলেন। মায়ের মন, ছেলে অন্তত সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকুক, এই ভেবে ওয়াদা করেছিলেন সত্য, কিন্তু এখন ছেলেকে দিয়ে দেন কিভাবে। অনেক পীড়পীড়ির পর মজ্‌জুব চলে গেলেন। এরপর থেকে দেখা গেলো সিদ্দিক আলী দিন দিন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে

পড়ছেন। এক পর্যায়ে তিনি পুরোপুরি পাগলই হয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত নোঙর দিয়ে বেঁধে রাখতে হলো, এমন অবস্থা। অনেক চেষ্টা তদবিরের পরও সিদ্দিক আলীর পাগলামী কিছুতেই দূর হলো না। আবার সেই মজ্জুবও পেছন ছাড়েন না। সময় সময় বাড়িতে এসে হাত ধরে টানাটানি করেন নিয়ে যেতে চান সিদ্দিক আলীকে। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে নোঙর দিয়ে বেঁধে লোকজন দিয়ে বদরপুরে ছাহেবের খিদমতে তাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো। বদরপুরী ছাহেব কিবলাহ তাকে দেখেই মুচকি হাসলেন এবং হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিতে নির্দেশ দিলেন। দেখা গেলো পূর্বের কোনো পাগলামীই আর নেই। তার স্বজনরা তাকে ছাহেবের খিদমতে রেখে আসেন। তিনি বদরপুরে অবস্থান করতে থাকেন যথারীতি।

এর মধ্যে আবারও সমস্যা দেখা দিলো। সেই মজ্জুব তাঁর সঙ্গীয় আরও মজ্জুবদের সাথে নিয়ে সিদ্দিক আলীর পিছু নিয়েছেন। এটা তখনই বুঝা যেতো, সিদ্দিক আলী যখনই ছাহেব বাড়ির বাইরে কোথাও বের হতেন। তখনই সেই মজ্জুব তার সাথীদের নিয়ে সিদ্দিক আলীকে ঘিরে ধরতেন। এবং তাদের সাথে নিয়ে যেতে চাইতেন। একদিন দেখা গেলো মজ্জুবরা একে একে ছাহেব বাড়ির সামনের রাস্তায় এসে জড়ো হচ্ছেন। দেখতে দেখতে মজ্জুবদের একটি দলই এসে রাস্তার উপর বসে পড়লেন। ওদিকে মজ্জুবরা চক্ষু বন্ধ করে বসে আছেন রাস্তায়। আর ছাহেব বসে আছেন বৈঠক খানায় মুরাকাবার হালতে। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকলো। এক সময় ছাহেব চক্ষু খুললেন এবং উচ্চস্বরে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! এদিকে মজ্জুবগণও একে একে উঠে যেতে লাগলেন। তাদের খুবই শ্রান্তও পর্যুদস্ত মনে হচ্ছিল। ছাহেব বললেন, আজ হুজুর পাক (সা.) এর খিদমতে সিদ্দিক আলীর ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করেছিলাম। হুজুর (সা.) শরীআতের পক্ষেই রায় দিয়েছেন। এই দিনের পর থেকে সিদ্দিক আলী নিরাপদ হয়ে যান। আলোচিত এই সিদ্দিক আলী হযরত বদরপুরী (র.) এর একান্ত মুরীদ ছিলেন। তিনি পীর সিদ্দিক আলী নামেই সমধিক পরিচিত।

তাওয়াজ্জুহ পেয়ে ধন্য হলেন তালিব

হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ বয়ান করেন, কোনো একদিন ফজরের নামাযের পর হযরত বদরপুরী ছাহেব কিবলাহ তরীকতের তালিবদেরকে তা'লীম-তাওয়াজ্জুহ দিচ্ছিলেন। এ সময় মাওলানা মহসিন নিমাইচানপুরী ছাহেব (হাইলাকান্দি, কাছাড়) আরয করলেন যে, তিনি দীর্ঘ দিন ছাহেবের খিদমতে আছেন, অথচ তার তেমন আধ্যাত্মিক উন্নতি হচ্ছে বলে মনে হয়

না। তিনি তখন ছাত্র ছিলেন। ছাহেব তার আরয শুনে কিছুক্ষণ নিরব থাকার পর তাকে খেয়াল করার নির্দেশ দিয়ে চক্ষু বন্ধ করে মুরাকাবায় মগ্ন হলেন। সময় যত যাচ্ছে মাওলানার চেহারার মধ্যেও ততো পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলো। এভাবে কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই মাওলানা নিমাইচানপুরী আর স্থির থাকতে পারলেন না, মাটিতে পড়ে গেলেন এবং জবেহ করা মোরগের ন্যায় ছটফট করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে আসলে উঠে বসলেন। এরপর হতে তার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পরে তিনি খিলাফত লাভ করেন। তরীকতের খিদমত করে করে তিনি দুনিয়া ত্যাগ করেন। বর্তমানে তার সুযোগ্য ছাহেবজাদা সিলসিলার খিদমতে নিয়োজিত আছেন।

ছাহেবের দুআয় পুত্র সন্তান লাভ

জনাব কারী গিয়াস উদ্দিন কোনাগ্রামী তার পিতা মরহুম ইদ্রীছ আলী সাহেবের বরাত দিয়ে বলেন, একে একে আমার ৬ বোনের জন্মের পর একটি পুত্র সন্তানের জন্য মা-বাবা খুবই ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। আমার বাবা বদরপুরী ছাহেবকে বাড়িতে আনলেন দাওয়াত করে। ছাহেবের খিদমতে খুবই কান্নাকাটি করে আরয করলেন, ছাহেব! আমার ৬টি মেয়ে, কোনো ছেলে সন্তান নেই। আমি আল্লাহর উপর সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট, তবে আমার মৃত্যুর পর মেয়েদের খোঁজ-খবর নেওয়ার মতো কেউ নেই। যদি একটি ছেলে থাকতো তাহলে মেয়েদের খবর করতো, এই বলে কাঁদতে থাকেন। ছাহেব চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, আল্লাহর কাছে চাও। বাবা বললেন, আমি যদি আল্লাহকে চিনতাম তবে ছাহেবকে কেন বলতাম। আপনি আল্লাহর কাছে আমার জন্য একটি ছেলে চেয়ে আনেন। আপনি দুআ করলে আল্লাহ ফিরাবেন না। ছাহেব দুআর জন্য হাত তুললেন। দুআতে বললেন, 'আল্লাহ! আমার ইদ্রীছ আলীকে একটি বেটা সন্তান দিলে তোমার বান্দাহর শান্তি হবে।' পরবর্তীতে আমার জন্ম হলো। মা-বাবারতো খুশির সীমা নেই। আমার জন্মের পরপরই আসরের নামায পড়ে বাবা ছাহেবের খেদমতে বদরপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। অসময়ে পায়ে হেঁটেই শেষ রাতে বদরপুর গিয়ে পৌঁছেন। বাদ ফজর ছাহেবের খিদমতে হাজির হয়ে কদমবুছি করেই কান্না জুড়ে দেন। তখন ছাহেব নিজে থেকেই বললেন, আল্লাহতো তোমাকে খুশি করলেন, তবে কাঁদছো কেন? বাবা রীতিমত অবাক হলেন, কারণ পুত্র জন্মের কথা ছাহেব জানলেন কি করে, অথচ জন্মের প্রায় সাথে সাথে বাবা বদরপুর রওয়ানা করেন। যাই হোক ছাহেব আমার নামও রেখে দেন। বাবা বলেছেন, ঐ রাতে ছাহেব খাদিমকে বলে রেখেছিলেন যে,

একজন মেহমান আসতে পারেন, তার খাবার যেন প্রস্তুত রাখা হয়। বাবা শেষ রাতে গিয়ে তার জন্যে তৈরি করে রাখা খাবার খেয়েছিলেন।

ট্রেন থেমে গেলো তাঁর জন্যে

জনাব ক্বারী গিয়াস উদ্দিন সাহেব বলেন, তাঁর পিতা মরহুম মো. ইদ্রীছ আলী বলেছেন, হযরত বদরপুরী (র.) একবার বড়লেখা অঞ্চলে সফরে ছিলেন। সফর শেষে বদরপুর যাওয়ার জন্যে শাহবাজপুর রেল স্টেশনে গিয়ে পৌছলে দেখা গেলো ট্রেন ছেড়ে গেছে। ইতোমধ্যে লোকজনও ছাহেবকে দেখে জড়ো হয়ে গেলো। ট্রেন ধরতে পারেননি এই জন্য ছাহেবকে মোটেই চিন্তিত মনে হচ্ছিল না। সঙ্গী-সাথীরা বরং এই ভেবে চিন্তিত হচ্ছিলেন যে, ট্রেন ফেল করার কারণে ছাহেব কিবলাহর তকলিফ হবে বৈকি। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ট্রেন ছেড়ে কিছু দূর যাওয়ার পর হঠাৎ করেই ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। কোনো অবস্থাতেই চালক ইঞ্জিন চালু করতে পারছিলেন না। কর্তব্যরত ইঞ্জিনিয়ারও ভেবে পাচ্ছিলেন না এর কারণ। ট্রেন থেকে লোকজন নেমে রাস্তার উপর হাটাহাঁটি করছিলো। স্টেশনে খবর এলো ট্রেন মাইলখানেক যাওয়ার পর ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে। লোকজন ছাহেবকে বলছিলো এই সুযোগে ট্রেন ধরার জন্য। ছাহেব বললেন, ড্রাইভারকে বলে দেখ। ট্রেন পেছনে আসে কি না। বদরপুরী ছাহেব স্টেশনে বসে আছেন, তিনি এই ট্রেনে যেতে চাইছিলেন, ট্রেন ছেড়ে আসায় স্টেশনে আটকা পড়েছেন, ড্রাইভার এই খবর জানলেন এবং এও তাকে বলা হলো, ছাহেব বলেছেন, পেছনে বেক করলে ইঞ্জিন স্টার্ট হয় কিনা দেখার জন্য। অগত্যা ড্রাইভার সেই চেষ্টাই করতে গেলেন। কী আশ্চর্যের বিষয়, লোকজন অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো, ট্রেন সত্যিই স্টার্ট নিলো এবং পেছনে বেক করতে লাগলো। ট্রেন স্টেশন পর্যন্ত এলে ছাহেব ট্রেনে উঠলেন, এবার ট্রেন সামনের দিকেও যথারীতি চলতে লাগলো। এই আশ্চর্যজনক ঘটনা সেদিন অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছিলো।

হারিয়ে যাওয়া ছুরি ফিরে এলো

বদরপুরী বড় ছাহেব বর্ণনা করেন, নীল রংয়ের হাতলওয়ালা একটা ফল কাটার ছুরি ছিলো ছাহেবের। বিশেষ করে সফরের অবস্থায় এটা তার সাথে থাকতো। বাড়িতেও এটা ব্যবহার করতেন ফল কাটার কাজে। একবার কুলাউড়া অঞ্চলে সফরকালে কিভাবে যেন ছুরিখানা হারিয়ে যায়। তিনি এতে খুব আফসোস করতে থাকেন এবং ইন্নালিল্লাহ পড়তে থাকেন। বাড়ি ফিরেও

তিনি ছুরিখানার কথা ভুলতে পারেননি। ইন্নালিল্লাহ পড়ে পড়ে রাতে ঘুমাতে যান। বড় ছাহেবজাদাও ছাহেবের সাথে শুয়ে ছিলেন। মশারী টানানো অবস্থায় ভারী কি যেন হঠাৎ লেপের ওপর পড়লো। কী আশ্চর্যের বিষয়! হাতে নিয়ে দেখা যায় এটা সেই ছুরি যেটি হারিয়ে যাওয়াতে ছাহেব বার বার ইন্নালিল্লাহ পড়ছিলেন। মশারীর উপর থেকে ছুরি পড়লো অথচ কোনো ছিদ্রও দেখা গেলো না মশারীতে।

মৃত্যু হলো বিলম্বিত

সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জের তৈকামাল নিবাসী ইঞ্জিনিয়ার ফজলুর রহমান সাহেবের স্ত্রী ছাকরাতের অবস্থায় ছিলেন। বাঁচার কোনও আশা নেই। এমতাবস্থায় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ভাবলেন, স্ত্রীর মৃত্যুতে প্রায় অত্যাসন্ন, জানাযাটা অন্ততো বদরপুরী ছাহেবকে দিয়ে পড়ানো উচিত। ছাহেব হয়তো অন্য কোথাও তাশরীফ নিয়ে নিবেন, এই ভেবে তিনি ছাহেবকে নিয়ে আসার জন্য গাড়ি পাঠালেন। ছাহেব তাশরীফ আনলেন। এসেই চাদর মুড়ি দিয়ে বাংলাঘরে শুয়ে পড়লেন। রোগীনির ন্যায় ছাহেবেরও গলায় আওয়াজ হতে লাগলো। বুঝা গেলো তিনি গভীর ঘুমে আছন্ন হয়ে পড়েছেন। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠে বসলেন। একই সাথে বাড়িতে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বিবি সুস্থ মানুষের ন্যায় উঠে বসলেন, আল্লাহর কি কুদরত! কামিল ওলীর ওসিলায় ছাকরাত ও মৃত্যু উভয়ই কত আশ্চর্যজনকভাবে বিলম্বিত হলো। এই মহিলা আরও দীর্ঘ দিন বেঁচে ছিলেন। [ঘটনাটি হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ বর্ণনা করেছেন।]

লোকটি সত্যিই পাগল হলো

আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ তাঁর পীর ও মুর্শিদ হযরত বদরপুরী (র.) এর কারামাত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একবার বদরপুরী ছাহেব কিবলাহ সঙ্গী-সাথীসহ কোথাও যাচ্ছিলেন। চলার পথে সঙ্গীয় এক ব্যক্তির কথা-বার্তা ও চাল-চলন দেখে ছাহেব বলে উঠেন, লোকটি পাগল নাকি? লোকটি প্রকৃতপক্ষে পাগল ছিলো না। কিন্তু, ছাহেব এই কথা বলার পর সত্য সত্যই পাগল হয়ে গিয়েছিলো লোকটি।

মশার উপদ্রব দূর হলো

বড়লেখা থানার গাজীটেকা আইলাপুর নিবাসী হাজী ইদ্রীছ আলী সাহেবের বাড়িতে বদরপুরী ছাহেব কিবলাহ তাশরীফ আনেন। রাতে খাওয়া-দাওয়ার

পর ছাহেব কিবলাহ আরাম করবেন। বাড়ির উত্তর প্রান্তের একটি ঘরে বিছানা করে দেওয়া হয়। ছাহেবকে বিছানায় রেখে ইদ্রীছ আলী সাহেব খেতে গেছেন, তার মা জিজ্ঞেস করলেন, ছাহেবকে মশারী টানিয়ে দেওয়া হয়েছে কি না। ইদ্রীছ আলী রসিকতার সুরে বললেন, পীর ছাহেবের আবার মশারী লাগবে কেন? মা ধমকের সাথে বললেন, যাও এক্ষুণি মশারী টানিয়ে দিয়ে আসো। ইদ্রীছ আলী মশারী টানাতে গেলেন। কিন্তু ছাহেব তাকে মশারী টানাতে দিলেন না। বললেন, মশারীর প্রয়োজন নেই। অনেক করে বলার পরও ছাহেব একই উত্তর দিলেন। শেষ পর্যন্ত বিরক্তির সুরে বললেন, এ ঘরে মশা লাগবে না, মশারীর দরকার নেই। বর্ণনাকারীগণ বলেন, যতদিন ঐ ঘরটি বহাল ছিলো ততদিন পর্যন্ত বাড়ির অন্যান্য ঘরে মশার উপদ্রব থাকলেও ঐ ঘরটিতে কখনো মশা দেখা যায়নি। জনাব কারী গিয়াস উদ্দিন কোনাগ্রামীসহ অনেকেই ঐ ঘরে অবস্থান করে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। অবশ্য পরে ঐ কাঁচা ঘরটি ভেঙ্গে ফেলে নতুন ঘর নির্মাণ করা হয়। (বর্ণনাকারী জনাব কারী গিয়াস উদ্দিন কোনাগ্রামী, জনাব আবদুল মালিক গাজীটেকা)

মুরীদ পেলেন জীবনের নিরাপত্তা

মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা থানার হিংলী গ্রামের মৌলভী তজম্মুল হুসেন সাহেবের পিতা ছিলেন বদরপুরী ছাহেব কিবলাহর মুরীদ। বছরের অধিকাংশ দিনই তিনি বদরপুরে কাটাতেন। দেশ বিভাগের ফলে তিনি এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সপ্তাহ দু'একের মধ্যেই তিনি অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতির মাঝে বদরপুর চলে যান। মুসলিম প্রধান অঞ্চল হিসেবে বদরপুরে তখনও শান্ত পরিস্থিতি ছিলো। ছাহেব বাড়িতে পনেরো দিনের মতো অবস্থান করার পর একদিন মধ্য রাতের দিকে বদরপুরী ছাহেব কিবলাহ মেহমান খানায় এসে তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেন। ছাহেব তাকে বললেন, তুমি এখনই বাড়িতে চলে যাও। তিনি (তজম্মুল সাহেবের বাবা) বললেন, ছাহেব! এতো রাতে কিভাবে যাবো! বদরপুরী ছাহেব কিবলাহ চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ নিরব থেকে আবারও বললেন, হ্যাঁ, তুমি এখনই রওয়ানা হও বাড়ির দিকে, আল্লাহ তোমাকে পৌঁছাবেন। এই বলে ছাহেব কিবলাহ ভেতর বাড়িতে চলে যান। এই দিকে তজম্মুল সাহেবের আব্বা আর কাল বিলম্ব না করে গভীর রাতেই পায়ে হেঁটে বাড়ির রাস্তা ধরলেন। চার-পাঁচ মাইল পথ হাঁটার পর তিনি এক মসজিদের পাশ দিয়ে যাবার সময় ক্লান্তি দূর

করার জন্য হাত-পা ধুয়ে মসজিদের বারান্দায় গিয়ে উঠেন। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থেকে এক সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। হঠাৎ ঘুমের মধ্যে আযানের শব্দ শুনে তার ঘুম ভেঙ্গে গেলে চোখ খুলে দেখেন, তিনি বাড়ির নিকটেই কাঠালতলী স্টেশনের টিকিট ঘরের বারান্দায় দাড়িয়ে আছেন। এতো দূরত্বের পথ কিভাবে অতিক্রম করলেন এই ভেবে তিনি হতভম্ব হয়ে পড়েন। অথচ, সারা দিন রাত হেঁটেও যে পথ অতিক্রম করার কথা নয়, ফজরের তখনও ঘন্টা দেড়েক বাকী। বাকী রাত স্টেশন মাষ্টারের ঘরে কাটিয়ে ফজরের নামায পড়ে বাড়িতে চলে আসেন। স্টেশন মাষ্টার ছিলেন তার পরিচিত। এতো রাতে স্টেশনে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে আশ্চর্যজনক এই ঘটনার বর্ণনা দেন। পরবর্তীতে জানা যায় যে, পরের দিন থেকেই সীমান্ত অঞ্চলে রায়ট শুরু হয়। ট্রেন এবং বাস থামিয়ে মুসলমানদের খুন করা হয়। লাগাতার বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করেছিলো এই অঞ্চলে। (বর্ণনায় ঃ মৌঃ তজম্মুল হোসেন, হিংলী, বড়লেখা, মৌলভীবাজার)

দুআর মধ্যেই বৃষ্টি ঝরলো

করিমগঞ্জ জেলার ভাঙ্গার কনকলস নিবাসী ইউছুফ আলী সাহেব বলেন, বহুদিন যাবত অনাবৃষ্টির কারণে মানুষ পেরেশান হয়ে পড়েছিলো। বদরপুরী ছাহেব কিবলাহকে দাওয়াত করে আনা হলো। ছাহেব এলাকার সকলকে নিয়ে ইছতেছকার নামায পড়লেন। নামাযান্তে প্রচন্ড রোদের মধ্যেও সকলকে ছাতা গুটিয়ে ফেলতে বললেন। অতঃপর মুনাজাত শুরু করলেন। আল্লাহর কি অপার রহমত! দুআ শেষ না হতেই মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হলো। ছাহেবের এই কারামতের কথা ভাঙ্গার অন্যান্য প্রবীণরাও বর্ণনা করেছেন।
অনুরূপ আরও বেশ কয়েকটি বর্ণনা দিয়েছেন অনেকে। এক বর্ণনায় কাজী মুতাহির আলী বলেন, বদরপুরের ঈদগাহ ময়দানে একবার ইছতেছকার নামায শেষে ছাহেব কিবলাহ দুআ শুরু করার পর দুআর মধ্যেই বৃষ্টি আরম্ভ হলো এবং বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে লোকজন বাড়িতে ফিরলো। ঘটনাটি এলাকায় বেশ প্রসিদ্ধ।

শিক্ষা পেলেন দরবেশ মুরীদ

হরিনগর নিবাসী জনাব হোসাইন আলী যিনি লোক সমাজে দরবেশ হোসাইন আলী নামে খ্যাত, তিনি বদরপুরী ছাহেব কিবলাহর মুরীদ ছিলেন। একদল

বলিষ্ঠ তাজী ঘোড়া ছিলো তার। সাধারণত: ঐ ঘোড়ায় চড়েই তিনি যাতায়াত করতেন। ছাহেব যখনই সফর থেকে বাড়ি ফিরতেন দরবেশ হোসাইন আলীও এসে উপস্থিত হতেন খিদমতে। দরবেশের বাড়ি ও ছাহেব বাড়ির মাঝখানে রয়েছে প্রবাহিত বরাক নদী। নদী পাড়ি দিয়ে ছাহেবের খিদমতে দরবেশের যখন তখন যাতায়াত লোকজনকে সন্দেহপ্রবণ করে তুললো। নদী তীরের কিছু লোক একদিন নদী ভর্তি পানির উপর দিয়ে দরবেশের ঘোড়া ছুটিয়ে চলার দৃশ্য দেখে ফেললে ব্যাপারটি এলাকায় প্রচার হয়ে যায়। কৌতুহলী লোকেরা দরবেশের যাতায়াতের পথে লক্ষ্য রাখতে থাকে। ছাহেব দরবেশকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন, "তুমি এই সব যা করছো তা ছেড়ে দাও। দরবেশ ছাহেবের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে মাথা নোয়ালেন। ভাবখানা যেন এমন, "আর কোনো দিন ওরকম হবে না।"

দরবেশ বাড়িতে ফিরার পথে ভাবলেন, ছাহেব যেহেতু নিষেধ করেছেন তাই শেষ বারের মতো আজ চলে যাই, আর কোনো দিন এমনটি করব না। আশ-পাশে লোকজনের উপস্থিতির টের না পেয়ে দরবেশ ভাবনা মতো পূর্ববত ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন বরাকের উপর দিয়ে। ঠিক যেই মাঝ নদীতে এসে পৌঁছলেন অমনি ঘোড়াসহ দরবেশ নদীতে তলিয়ে যেতে লাগলেন। ঘোড়াসহ দরবেশ ডুবে মরছেন এই দৃশ্য দেখে লোকজন চিৎকার দিতে আরম্ভ করলো। দুই তীরের লোকজন ছুটে এসে ঘোড়া ও দরবেশকে টেনে তুললো পাড়ে। দরবেশ ডুবে মরা থেকে রক্ষা পেয়ে মুর্শিদ বদরপুরীর খিদমতে এসে নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলেন।

সফরের নৌকায় মাছ উঠে পড়লো

একবার নৌকার সফরে ছাহেবের খাদিম ও সঙ্গীয়রা দুপুরের খাবারের জন্য তরকারীর কোনো ব্যবস্থা নেই, এই মর্মে বলাবলি করছিলেন। সময় যতই গড়িয়ে যাচ্ছিল তারা ততই উদ্বিগ্ন হচ্ছিলেন এই ভেবে যে, ছাহেব কিবলাহর সামনে কি দিয়ে খাবার পেশ করা যায়। নিজেদের অবস্থা যাই হোক ছাহেব কিবলাহ ক্ষুধায় তকলিফ পাবেন এই চিন্তায় তারা খুবই পেরেশান হচ্ছিলেন। অনেক ভেবে-চিন্তে খাদিম বিষয়টি ছাহেবের খিদমতে পেশ করলেন। আল্লাহ একটা কিছুর ব্যবস্থা করবেন এই বলে ছাহেব নিরব থাকলেন। এই সফরে অনেকের মধ্যে খাদিমানের হাজী রফীকুর রহমান ছাহেবের সাথী ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আমরা লক্ষ্য করলাম আমাদের নৌকার আগে আগে মাছের মতো একটা কিছু খেলা করে করে

এগিয়ে যাচ্ছে। জিনিষটা কি তা আমরা ভালো করে দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এমতাবস্থায় আমাদের সবাইকে অবাক করে মস্ত বড় একটা রুই মাছ লাফ দিয়ে নৌকায় উঠে পড়লো। আমরা আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করলাম। মাছ ছাহেবকে দেখানো হলো। সবাই তৃপ্ত হয়ে সেদিন এই রুই মাছ দিয়েই খাওয়া-দাওয়া করলাম।

চোর আটক হলো

বুন্দাশীলের হাজী আব্দুল করীম বর্ণনা করেছেন, গভীর রাতে চুরি করার উদ্দেশ্যে দুটি লোক ছাহেব বাড়িতে প্রবেশ করে। ছাহেব ধ্যান মগ্ন থাকা অবস্থায় তা বুঝতে পেরে হাতের ছড়িখানা মাঠিতে পুতে দিলেন। অমনি চোরেরাও যে যেখানে ছিলো সটান দাঁড়িয়ে পড়লো। নড়াচড়া করার কোনো শক্তিই থাকলো না এদের। ভোরবেলা এদেরকে শিলকায়াসম দাড়িয়ে থাকতে দেখে লোকেরা আটক করে। তারা তাদের চুরির উদ্দেশ্যের কথা স্বীকার করে এবং ছাহেবের খিদমতে তাওবা করে আর কোনো দিন এ ধরনের অপকর্ম না করার অঙ্গীকার দেয়। ছাহেব তাদেরকে নসীহত করে ছেড়ে দিতে বলেন।

চিরদিনের জন্য বন্ধ হলো কুকুরের মুখ

কুতবে যামান হযরত বদরপুরী (র.) অভ্যাসমত একদিন মুরাকাবার অবস্থায় আছেন। এমন সময় একটা কুকুর তাঁর ঘরের কাছে এসে বিকট আওয়াজে ঘেউ ঘেউ করে উঠলে ছাহেব অত্যন্ত বিরক্তির সাথে 'উফ' শব্দ উচ্চারণ করলেন। অমনি কুকুরের মুখ জীবনের তরে বন্ধ হয়ে গেলো। এই কুকুরটি ছাহেব বাড়িতে থাকতো। কিন্তু ঐ দিনের পর আর কোনো দিন এই কুকুরের মুখে শব্দ শোনেনি কেউ।

ভেঙ্গে পড়লো প্রকাণ্ড গাছ

ছাহেব বাড়ির পেছনে নবীন রাম নামের এক হিন্দু লোকের বাড়ি ছিলো। নবীনের একটি বিরাট গাছ ছাহেব বাড়ির সীমানায় এসে পড়েছিলো। ঝড়-তুফানের সময় গাছের বিরাটকায় ডাল ভেঙ্গে পড়ে বাড়ির সীমানা দেয়াল ও ঘরের ক্ষতি সাধনের সমূহ সম্ভাবনা ছিলো। তাছাড়া বাতাসের ঝাপটায় ডালপালা যখন ঘরের টিনে আঘাত করতো তখন বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের জন্য তা ভয়ের কারণ হতো। তাই ছাহেব নবীনকে কিছু টাকা দিয়ে গাছটি কেটে নিতে বললেন। নবীন টাকা না নিয়ে বরং গাছটি সে কেটে নিবে বলে ওয়াদা

করলো। কিন্তু গাছ সে কাটল না। ছাহেব কিছুদিন পর সফর থেকে ফিরে এসে গাছটি যথাস্থানে দেখতে পেয়ে খুবই মনক্ষুন্ন হলেন। এই রাতেই গাছটি কোনো কিছুর ক্ষতি ছাড়াই উপড়ে মাটিতে পড়ে যায়। এই ঘটনায় নবীন ছাহেবের কাছে এসে ক্ষমা চাইলো এবং তার প্রতি অসন্তুষ্ট না হতে অনুরোধ করলো। ছাহেব তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

আশ্চর্য মাছ শিকার

কুটি মিয়া নামে এক ব্যক্তি ছাহেবের খানকাহ শরীফে অবস্থান করতেন। ছাহেবের খাদিম হিসাবে খুবই আন্তরিক ছিলেন তিনি। একদিন মেহমান মুসাফিরের খাবারের তরকারীর বিশেষ ব্যবস্থা না থাকায় ছাহেবকে বলা হলো। ছাহেববাড়ির পাশ ঘেঁষেই বয়ে গেছে বরাক নদী। ছাহেব কুটি মিয়াকে বড়শী নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে হুকুম করলেন। তখন বেশ রাত হয়ে গিয়েছিলো। ছাহেবও সঙ্গে গেলেন এবং তীরে বসে রইলেন। খাদিম বিসমিল্লাহ বলে নদীতে বড়শী ফেলতেই বড়শীতে টান অনুভব করলেন। খাদিম বড়শী টানলেন অলস গতিতে ভাবখানা এমন, বড়শী ফেলতেই মাছ ধরবে কেমন করে, দেখি কি ব্যাপার। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়! দেখা গেলো বেশ বড় একটি মাছ বড়শীতে আটকা পড়েছে। খাদিম আবার বড়শী ফেললেন। আবারও অনুরূপ টান অনুভব করলেন বড়শীতে। টেনে আনলেন কিনারে। দেখলেন, আগেরটার মতোই একটি মাছ আটকা পড়েছে। ছাহেব নদীর তীরে বসাই ছিলেন এতক্ষণ। খাদিমকে চলে আসতে বললেন তিনি। কুটি মিয়া ভাবলেন, বড়শী ফেলতেই যেহেতু মাছ ধরছে সুতরাং আরও কয়টা ধরলে মন্দ কি। তাই ছাহেবকে বাড়িতে তাশরীফ নিয়ে নিতে অনুরোধ করে নিজে আবারও বড়শী ফেলে অপেক্ষা করতে থাকলেন। কিন্তু না, তার অপেক্ষার যেন আর শেষ হচ্ছে না। বড়শীতে মাছ ধরা তো দূরের কথা, নদীর পানি যেন স্থির হয়ে আছে। অগত্যা খাদিমকে ফিরে আসতে হলো, দুটোতেই সন্তুষ্ট থেকে। বরাক নদীতে বড়শী দিয়ে মাছ শিকারের আরও বহু ঘটনার কথা শুনা যায়।

অচেনা বুযুর্গের সাথে মুনাজাত

নবীগঞ্জ দিনারপুরের আনগাও এর মাষ্টার আবদুল অদুদ সাহেব এক রাতে বদরপুর অবস্থান করছিলেন। গভীর রাতে মেহমান খানায় শুয়ে শুয়ে কারও পায়ের শব্দ শুনলেন। খেয়াল করে বুঝলেন, ছাহেব বাড়ির ভেতর থেকে কে যেন বের হয়ে আসছেন। কৌতুহলবশতঃ তিনি ঘর থেকে বের হয়ে দেখতে

চেষ্টা করেন। আলো-আঁধারের মাঝে তার বুঝতে কষ্ট হলোনা যে ইনি বদরপুরী ছাহেব কিবলাহ। তিনি দেখলেন ছাহেব কিবলাহ বাড়ি থেকে বের হয়ে কোথাও যেন যাচ্ছেন। মাষ্টার সাহেবও পিছু নিলেন চুপিচুপি। দেখেন ছাহেব রেল লাইন পার হয়ে ক্রমশঃ জঙ্গলের দিকে ঢুকে পড়ছেন। তিনিও ঢুকে পড়লেন জঙ্গলে। গভীর রাত তার উপর জীব জানোয়ারের ভয়, মাষ্টার সাহেব যতই জঙ্গলের দিকে এগুচ্ছেন ক্রমে ভীত হয়ে পড়ছেন। তিনি দ্রুত হেটে গিয়ে ছাহেবের নিকটবর্তী হয়ে পড়লেন ভয় কাটানোর জন্য। এক পর্যায়ে দেখলেন হযরত বদরপুরী ছাহেব থেমে গেছেন এক জায়গায়। সেখানে আরও একজন বুযুর্গকে দেখলেন তিনি। অনতি দূর থেকে লক্ষ্য করে তিনি চেনার চেষ্টা করলেন এই বুযুর্গকে। কিন্তু না কখনো এই বুযুর্গকে দেখেছেন বলে মনে হলো না তার। অতি ঘনিষ্ট ভাবে ছাহেবের কাছাকাছি এলেন এই বুযুর্গ। দুজনে মিলে মুনাজাত করতে লাগলেন। ছাহেব পিছনে তাকিয়ে মাষ্টার সাহেবকে ডেকে বললেন মুনাজাতে শরীক হতে। অনেকক্ষণ পর মুনাজাত শেষ হলো। ছাহেবের সাথে তিনিও ফিরে আসলেন বাড়িতে।

অনুরূপভাবে ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ ও তাঁর পিছু পিছু গিয়ে অচেনা বুযুর্গের সাথে মুনাজাতে শরীক হয়েছিলেন।

অমনযোগী মাওলানা মুরীদ হলেন

নবীগঞ্জ থানার আউশকান্দির মাওলানা আবদুল ওয়াহাব সাহেব কুলাউড়া হাইস্কুলের মৌলভী ছিলেন। তিনি কুলাউড়ার হাফিজ আফতাব খাঁ ছাহেবের বাড়িতে লজিং থাকতেন। হযরত বদরপুরী ছাহেব কিবলাহ খাঁ সাহেবের বাড়িতে যখনই তাশরীফ আনতেন, মাওলানা সাহেবকে তেমন মনযোগী মনে হতো না। হাফিজ সাহেব এটা লক্ষ্য করতেন কিন্তু কিছুই বলতেন না। এখানে অবস্থানকালে একদিন বিকেলের দিকে ছাহেব কিবলাহ কোথাও যাচ্ছিলেন। দেখা গেলো মাওলানা সাহেবও তার পিছু পিছু যেতে লাগলেন এবং রাতে ছাহেব কিবলাহর সাথেই ফিরে আসলেন। পরের দিন থেকে দেখা যায়, মাওলানা সাহেব ছাহেব কিবলাহর সঙ্গ ছাড়ছেন না। মাওলানার হঠাৎ এই পরিবর্তনে অনেকেই আশ্চর্য হলেন। শেষ পর্যন্ত ইনি বদরপুরী ছাহেবের মুরীদ হলেন এবং কালক্রমে খিলাফতপ্রাপ্ত হন।

দূরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ

কুলাউড়ার দেওয়ান জানু মিয়া সাহেব ছিলেন বদরপুরী ছাহেবের মুরীদ। তার

স্ত্রী দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত ছিলেন। সময় সময় জানু মিয়া ছাহেব কিবলাহ্‌র নিকট স্ত্রীর জন্য দুআ চাইতেন। একদিন একখানা শাড়ি ও কিছু সোনার গহনা নিয়ে ছাহেব কিবলাহ্‌র খিদমতে হাজির হয়ে বললেন, 'বিবি এগুলো দিয়ে তার জন্য শেষ দুআ চাইতে বলেছেন।' ছাহেব চক্ষু বন্ধ করে কিছু সময় নিরব থেকে অনেকটা রাগত স্বরে ফরমালেন, জানু মিয়া! কি আখেরী দুআ! নিয়ে যাও এগুলো। মালিকই এগুলো ব্যবহার করবেন। তুমি তো অনেক টাকা-পয়সাই দান-খয়রাত করেছো, এবার বাড়ি গিয়ে একটি গরু রোগীকে স্পর্শ করিয়ে জবেহ্ করে মিসকিনদের মধ্যে বন্টন করে দাও। কথা মতো বাড়িতে ফিরে জানু মিয়া সাহেব একটি গরু বন্টন করে দিলেন। পরদিন সকালে রোগীনীর সেবা-শশ্রুষাকারিণী মহিলা জানু মিয়ার মায়ের কাছে জানতে চাইল যে, তার পুত্রবধুর রোগটা কী? জানু মিয়ার আম্মা এতে খুবই অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি এত দিন ধরে বউমার সেবা করে আসছো, অথচ এখনও জানোনা তার অসুখটা কী? তারতো 'সূতিকা বাই' হয়েছে।' কথা শুনে কাজের মহিলাটি যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললো, হায় আল্লাহ! আমিতো এই রোগের একটি অব্যর্থ চিকিৎসা জানি।' এই বলে সে একটি ভরণ তৈরি করে রানীর মাথায় দিলো। আশচর্যের বিষয়, সকালে ভরণ মাথায় বসালো আর দুপুর হতে না হতেই মৃত্যু শয্যায় শায়িত জানু মিয়ার বিবি নিজে নিজেই উঠে বসলেন এবং পূর্ণ সুস্থতা লাভ করলেন।

মনের কথা গোপন রইলো না

হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ্ বর্ণনা করেন, নবীগঞ্জ থানার আউশকান্দির হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব ছাহেব ছিলেন বদরপুরী (র.) এর খলীফা। একবার বদরপুরী ছাহেব কিবলাহ্ নবীগঞ্জের ভাটি অঞ্চলে সফরের উদ্দেশ্যে শেরপুরে যখন পালকীতে উঠছিলেন, তখন হঠাৎ করে সঙ্গীদের বললেন, এ সফরে আর যাবো না। পালকী ফিরিয়ে নাও। মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব ছাহেবও এসময় সাথে ছিলেন। উপস্থিত সকলেই এর কোনো ভেদ বুঝতে পারলেন না। ছাহেব শেরপুরের জনৈক মহাজন সাবের জিপ নিয়ে মৌলভীবাজারের যমুনীয়ার জনাব শামসুর রহমান চৌধুরীর বাড়িতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন।

এদিকে খলীফা মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব ছাহেব পাগল হয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় কয়েকবার তাকে বদরপুর নিয়ে যাওয়া হলো, কিন্তু কোনো

সময়ই ছাহেবের সাথে দেখা হলো না। তারা যখন যান, ছাহেব তখন অন্যত্র সফরে থাকেন। এভাবে বেশ কিছু দিন যাওয়ার পর আব্দুল ওয়াহাব ছাহেবের নিকট আত্মীয়রা আমার বাড়ি (ফুলতলী) এসে তাদের সাথে বদরপুর যেতে বলেন। আমি দিন তারিখ জানিয়ে দিলাম। আমি তখন বদরপুর মাদরাসার শিক্ষক। নির্ধারিত দিনে তাদের সাথে নিয়ে বদরপুর গেলাম। ছাহেব বাড়ির অনতিদূরে বদরপুর বাজারে আব্দুল ওয়াহাব ছাহেব গংদের রেখে আমি ছাহেবের খিদমতে একা গেলাম। নিবেদন করলাম, সন্তানের ক্ষতি বা কষ্টে পিতার কোনো লাভ আছে কিনা? ছাহেব কিবলাহ ফরমালেন, না। আমি বললাম, আউশকান্দির আব্দুল ওয়াহাব ছাহেবকে পাগল অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছে, ছাহেব ইজাযত দিলে এখানে হাজির করবো। ছাহেব ফরমালেন, সেদিন নবীগঞ্জ সফরের জন্য পালকীতে। যখন উঠছিলাম, তখন আব্দুল ওয়াহাব মনে মনে ভাবছিলেন যে, 'ছাহেব যখন আমাকে খিলাফতী প্রদান করেছেন, তখন এই এলাকায় আমি থাকতে ছাহেব কেনো কষ্ট করছেন।' আর তখনি আমি সফর বন্ধ করে দেই। এরপর তাকে সামনে আনতে হুকুম দিলেন। সামনে নিয়ে আসা হলে মাথায় হাত রেখে দুআ দিলেন। আর তখনি আব্দুল ওয়াহাব ছাহেব সুস্থ হয়ে উঠলেন। সেদিন ছাহেবের যাত্রা স্থগিত করার রহস্য সকলে অনুধাবন করতে পারলাম।

নদীর উপর দিয়ে দরবেশের ঘোড়া ছুটানো বন্ধ হলো

বদরপুরের বড় ছাহেব বর্ণনা করেন, হুছন আলী দরবেশ ছিলেন, বদরপুরী ছাহেব কিবলাহর স্নেহভাজন এক মুরীদ। তিনি মজ্‌জুব অবস্থায় থাকতেন। তিনি একটি বড় ঘোড়ায় চড়তেন আর সঙ্গে থাকতো আরও কয়েকটি ঘোড়া। একবার বর্ষা মওসুমে ছাহেব বাড়ির আশপাশের রাস্তা-ঘাট, নদীর পার সবই তলিয়ে যায় পানিতে। একদিন গভীর রাতে পানির মধ্যে শব্দ তুলে হুছন আলী দরবেশ ঘোড়ায় চড়ে উপস্থিত হলেন ছাহেব বাড়িতে। সঙ্গে তার বড় ছেলে। বড় ছাহেবজাদাকে ডেকে চা খাবেন বলে জানালেন। ভেতর বাড়ি থেকে ছাহেবানী তা শুনে বড় ছাহেবকে বললেন, দুধ শেষ হয়ে গেছে, দুধ ছাড়া চা খাবেন কিনা জিজ্ঞাসা করতে। বড় ছাহেব যখন বললেন, দুধ নেই, তখন দরবেশ চা চুলায় বসাতে বলে পানিতে শব্দ তুলে ছেলেকে নিয়ে অন্ধকারে কোথাও হারিয়ে গেলেন। অল্প সময় পরেই ফিরে আসলেন। হাতে

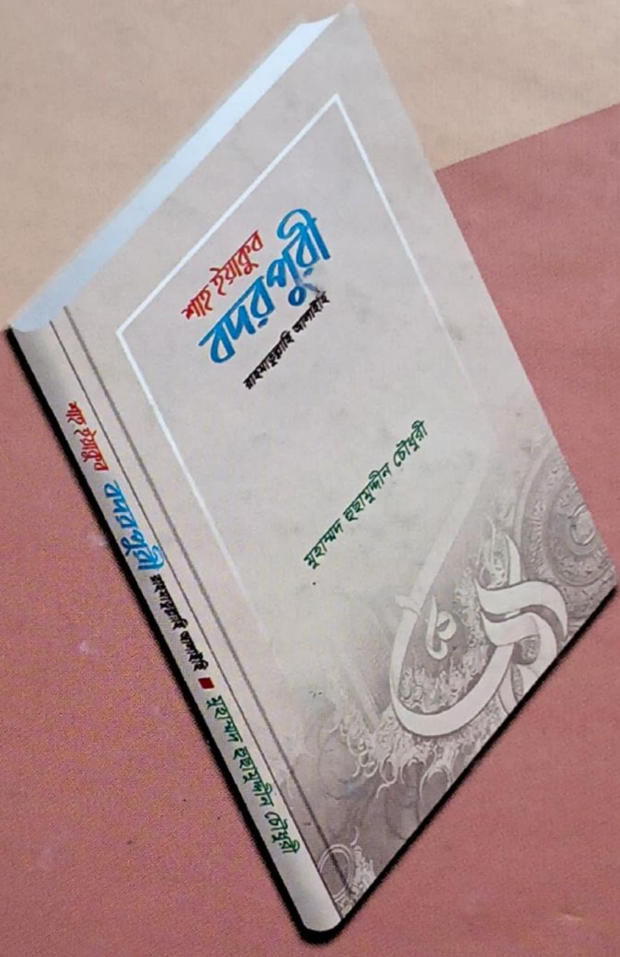
রশিতে ঝুলানো পাত্রে রয়েছে দুধ। ঘোড়ার উপর থেকে বড় ছাহেবের হাতে দিলেন। চা খেলেন, এরপর চলে গেলেন। পরদিন দরবেশের ছেলের কাছে বড় ছাহেব জানতে চাইলেন, গত রাতে তোমাকে সাথে নিয়ে দরবেশ ছাহেব দুধ কোথা থেকে আনলেন? প্রশ্ন শুনে ছেলেরও মনে প্রশ্ন জাগলো, তাইতো, এতো রাতে বাড়িতে যেয়ে দুধ আনলাম তাতো ঠিক, কিন্তু এই ভরা বরাক নদী কিভাবে পার হলাম! ছেলে বললেন, আমি বাবার পেছনে পেছনে হাঁটু পানিতে ঘোড়া ছুটাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখলাম বাড়ি পৌছে গেছি। বাড়ি থেকে দুধ নিয়ে আবার এভাবেই ফিরে আসি আপনাদের বাড়িতে। নদী কিভাবে পার হলাম তা টের পাইনি। এভাবে হুছন আলী দরবেশ (র.) প্রায়ই নদীর উপর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আসা-যাওয়া করতেন। লোক জানাজানি হয়ে গেলে বদরপুরী ছাহেব কিবলাহ তাঁকে এরকম করতে বারণ করেন। এমনকি তাকে ডেকে নিয়ে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। দরবেশ তাতে লজ্জিত হয়ে আর এমন করবেন না বলে মনস্থির করলেন। ছাহেব বাড়ি থেকে বের হয়ে বরাক নদীর অপর পাড়ে নিজের বাড়ি রওয়ানা হলেন। নদী ঘাটে এসে আশপাশে লোকজন নেই দেখে ভাবলেন ছাহেব যেহেতু বারণ করেছেন তাই আজ শেষ বারের মতো চলে যাই আর কোনো দিন যাবো না। ঘোড়া ছুটালেন পানির উপর দিয়ে। নদীর মধ্যখানে যাবার পর আর ঘোড়া চলে না। ক্রমে ডুবে যাচ্ছে ঘোড়া। সঙ্গে দরবেশও। চিৎকার শুরু করলেন দরবেশ। দুই পারের লোকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করলো। তিনি সাথে সাথে ছাহেব বাড়িতে ফিরে এসে ছাহেব কিবলাহর নিকট ক্ষমা চেয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। আর কোনো দিন এভাবে যাতায়াত করেননি।

হাতিটিকে শেষ পর্যন্ত সাপেই কাটলো

উমরপুরের জমিদার চৌধুরী সাজ্জাদুর রহমান সাহেব বদরপুরী ছাহেবের মুরীদ ছিলেন। তার বড় একটি হাতি ছিলো। তার বাড়িতে একদিন অবস্থানকালে ছাহেব হাতিটি দেখে তা বিক্রি করে আরেকটি বাচ্চা হাতি কিনতে বললেন। কিন্তু, চৌধুরী সাহেবের অল্প বয়সী ছেলে হাতি বিক্রি করতে দিচ্ছিল না। কিছুদিন পর একটি বিষধর সাপ ঐ হাতিটিকে দংশন করায় হাতিটি মারা গেলো। আর তখনই বুঝা গেলো, ছাহেব কেন হাতি বিক্রি করে দিতে বলেছিলেন।

দ্রুত নেমে গেলো বন্যার পানি

প্রবল বন্যায় এক সময় বরাক নদীর তীর প্লাবিত করে দুই ধারের বাড়ি-ঘর ডুবু ডুবু অবস্থা করে দিলো। ছাহেব বাড়ির খানকা ঘরের কাছাকাছিও পানি এসে পৌছল। চার দিকে মানুষের পেরেশানীর অন্ত ছিলো না। পানি আরও বাড়লে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা- এই ভেবে লোকজন হয়রান হয়ে ছাহেব কিবলাহর কাছে দুআ চাচ্ছিলেন। খানকাহ শরীফে মুহিব্বিন পরিবেষ্টিত ছাহেবকে তাঁর কোনো এক খাদিম খানকার পুরনো একখানা কাঁথা যা একেবারেই ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছিলো, তা কি করা যায় জানতে চাইলে, ছাহেব তা বন্যার পানির বরাবর রেখে আসতে বলেন। কথামতো তা করা হলো। আশ্চর্যের বিষয়, লক্ষ্য করা গেলো, প্রবল বন্যার গতি ছেড়া কাঁথায় এসে থেমে গেছে। আর এভাবেই এক ইঞ্চি পানিও না বেড়ে দ্রুত বেগে ধাবমান বন্যা দ্রুত বেগেই নামতে শুরু করলো।



PARWANA PUBLICATIONS

পরওয়ানা পাবলিকেশন্স